

আমার বাংলা বই



পঞ্চম
শ্রেণি



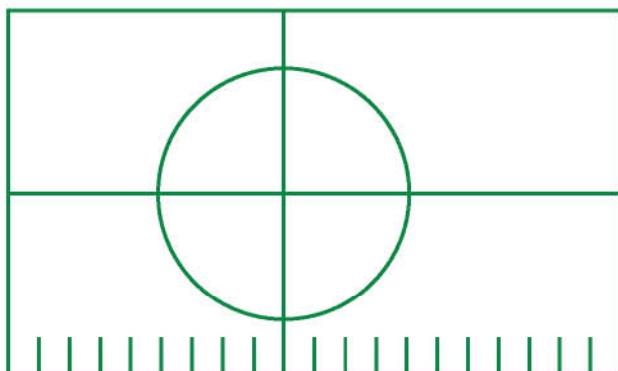
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি
ভরাট বৃত্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি



দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত $10 : 6$ । অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য 305 সেমি (10 ফুট) হয়, প্রস্থ 183 সেমি (6 ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের 20 ভাগের 9 ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

305 সেমি \times 183 সেমি ($10' \times 6'$)

152 সেমি \times 91 সেমি ($5' \times 3'$)

76 সেমি \times 46 সেমি ($2\frac{1}{2}' \times 1\frac{1}{2}'$)

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে দ্রাঘে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অস্ত্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী মেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে দ্রাঘে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে দ্রাঘে পাগল করে,
ও মা, অস্ত্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী মেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

পঞ্চম শ্রেণি

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

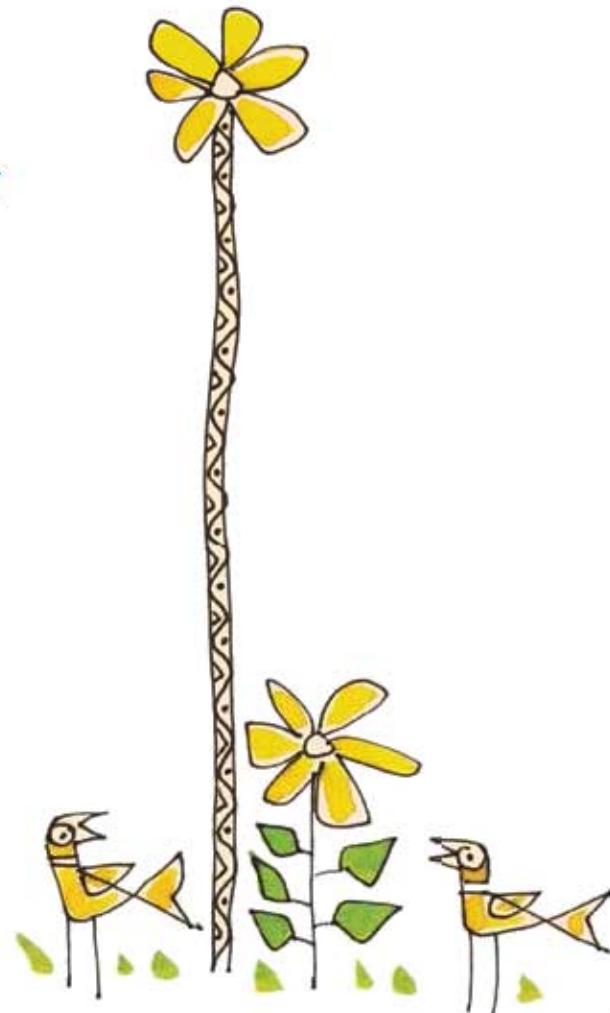
বালাবৎ মাঝুদ

মহাপ্যদ সামীউল হক

ড. মাসুদুর রহমান

শিল্প সম্পাদনা

ছাণ্ডে খান



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২০

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিপ্লব। তার সেই বিপ্লবের জগৎ নিয়ে ভাবনার অস্ত নেই। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষার্থীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিপ্লববোধ, অসীম কৌতুহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বাংলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলা কেবল একটি বিষয় নয়, এটি সকল বিষয় শেখার মাধ্যম। এদিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আনন্দময় পরিবেশে আয়ন্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই বাংলা পাঠ্যপুস্তকটি প্রয়োন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠে শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা যেমন বিবেচনা করা হয়েছে তেমনি বৈচিত্র্যময় করার দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠ যথাসম্ভব নির্ভার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সহজ ও সাবলীল বাক্য। এ শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা/শিখনফলভিত্তিক পাঠ ধারাবাহিক অনুশীলন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে পাঠের শেষে অনুশীলনীমূলক কাজের নমুনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী, কৌতুহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যক্তিক্রমী প্রয়াস।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বত্ত্ব প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচুর্ণি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সম্পূর্ণ সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ শুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

নির্দেশনা

পঞ্চম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষা শিখনে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পাঠ সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, কল্পনা-নির্ভর ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় পাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে সংগৃহীত ভাষা-পরিম্বল বিবেচনা করে পাঠ নির্বাচন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ভাষা শিখন প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীদের জীবন-ঘনিষ্ঠ করার জন্য ভাষাসমগ্র পদ্ধতিকে (Whole Language Approach) ভাষা শিখনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণির এ পর্যায়ে ভাষা শিখনের বিশেষ করে পড়ার ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রয়োজন হয়। এ পাঠ্যপুস্তকে ভাষা দক্ষতা হিসেবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক শিখন-অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত শিখন-শেখানো কৌশল ব্যবহার করবেন।

শোনা ও বলা

শ্রেণিকক্ষে শোনা ও বলা সংগৃহীত শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাতে শিক্ষক নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেন।

- শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী শুনতে পারে এমন শুন্তিগ্রাহ্য স্বরে, স্পষ্টভাবে ও প্রয়োজিত উচ্চারণে কথা বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শুনতে বলবেন;
- চিন্তার উদ্দেক করে এমন প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন;
- চিন্তা করতে ও পর্যাণ কথা বলতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন;
- আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাবেন;
- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিমত, মতামত প্রকাশের সুযোগ দেবেন;
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।

পড়া

পঞ্চম শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত পর্যায়ে পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন তা হলো-

- শুন্ধ, স্পষ্ট ও প্রয়োজিত উচ্চারণে পড়া;
- শুন্ধ উচ্চারণে শব্দ পড়া;
- শব্দের বানান, অর্থ ও বাক্য পড়া;
- ঠিক গতিতে বিরামচিহ্ন মেনে বাক্য পড়া ও অর্থোন্ধার করা;
- অনুচ্ছেদ পড়ে অর্থোন্ধার করা;
- পড়া সংগৃহীত শিখন-অনুশীলনী সম্পন্ন করা;
- যুক্তব্যঙ্গন স্পষ্ট ও শুন্ধ উচ্চারণে পড়া।

লেখা

শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় লিখতে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে লেখার কাজ এককভাবে করাতে পারেন। শিক্ষক ভুট্টিতে এমনকি দলেও শিক্ষার্থীদের লেখার কাজ করাতে পারেন। আগোচনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজের মতামত নিজের ভাষায় লেখার দক্ষতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে। শিক্ষার্থীরা সহজ বাকে নিজেদের পছন্দমতো শব্দ দিয়ে লেখার কাজ শুরু করতে পারে।

শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অবস্থা ও শিখন-শেখানো কৌশলের কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সম্বর্কে নির্দেশনা

তাষা শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষে নিচের নির্দেশনা ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠ্যপুস্তককে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। পঠনের জন্য প্রতিটি পাঠের শেষে ভাষা শিখনের জন্য সহায়ক কর্মকাণ্ড রয়েছে। পড়ার জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠ শেষে শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

প্রতিটি পাঠ পরিচালনার তিনটি পর্যায় থাকবে। পর্যায় তিনটি হচ্ছে :

পর্যায় ১: নির্ধারিত পাঠের অর্থ উদ্ধারের পর্যায়

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর নিজের আগ্রহ, বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে শিক্ষক ভাষা শিখন-শেখানোর জন্য ব্যবহার করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। এটি মূলত পাঠ ও পাঠসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রাথমিক পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের অর্থ বুঝতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন।

পর্যায় ২: ভাষা-শিখন সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা

এটি মূলত শিক্ষার্থীদের ভাষা-দক্ষতা শিখনের জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ভাষা-দক্ষতা হিসেবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা-সংশ্লিষ্ট শিখন কর্মকাণ্ডে সম্মত হবে। শিক্ষক এ পর্যায়ে ভাষা-শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে সম্মত করাবেন।

পর্যায় ৩: অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এ পর্যায়ে নির্ধারিত পাঠ থেকে অর্জিত শিখন শিক্ষার্থীরা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। এ পর্যায়ে শিক্ষক জীবন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত শিখন ব্যবহারে শিক্ষার্থীর দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করবেন। অর্জিত শিখন যাতে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে তা এই পর্যায়ের শিখন-শেখানোর কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনার তিনটি পর্যায় শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন।

১. নির্ধারিত পাঠের অর্থ উদ্ধারের পর্যায়

এ পর্যায়ে পাঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন।

- প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পাঠ শুরু করা;
- পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি বিশ্লেষণ করা;
- সম্ভাব্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা আলোচনা করা;
- পাঠের শিরোনাম পড়তে বলা;
- পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পাঠের শিরোনামের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাওয়া;
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শুধু, সম্পর্ক ও প্রমিত উচ্চারণে নির্ধারিত পাঠ পড়া;
- শিক্ষার্থীদের পড়তে দেওয়া ও পঠিত অংশের অর্থ অনুধাবন করার সুযোগ প্রদান;
- পাঠের নির্ধারিত অংশের মূল শব্দ চিহ্নিত করতে বলা ও সংশ্লিষ্ট বাক্য সরবে পড়তে বলা;
- প্রশ্ন করতে ও মতামত প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।

২. ভাষা-শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষা-শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শিক্ষক পরিচালনা করবেন। পাঠের শিখনফলের সাথে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন শিখন-কর্মকাণ্ডের (learning activities) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষা-দক্ষতা অর্জনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। ভাষা-শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হচ্ছে—

- নতুন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ;
- যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ ও যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ গঠন;
- পাঠ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-উত্তর বলা ও লেখা;
- বিপরীত শব্দ জানা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ;
- জোড় শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি;
- বিরামচিহ্ন হিসেবে দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক সম্পর্কে জানা ও বাক্যে তা ব্যবহার;
- কথোপকথনভিত্তিক বাক্য বলা ও লেখা;
- ছবি দেখে বাক্য বলা ও লেখা;
- নির্ধারিত বিষয়বস্তু যেমন-নদী, ঝাতু, প্রিয় প্রাণী ইত্যাদি সম্পর্কে একাধিক বাক্য লেখা;
- পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সমমানের গল্প, কবিতা বলা;
- নিজের ভাষায় পঠিত বিষয়বস্তু বলা ইত্যাদি।

উল্লিখিত শিখন-কর্মকাণ্ডে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তাবে অংশগ্রহণ করাবেন। প্রতিটি শিখন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত চর্চার সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের সাথে এ পর্যায়ে শিখন-কর্মকাণ্ডসমূহ শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে পরিচালনা করবেন। শব্দের অর্থ আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানা, জীবন-ঘনিষ্ঠ উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষক অর্থ আলোচনা করবেন। যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শব্দে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ দেখিয়ে তারপর শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বর্ণ ভেঙে দেখাবেন। নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে একাধিক শব্দ উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের থেকে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ সম্পর্কে শিক্ষক জানতে চাইবেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানোর জন্য শিক্ষক দেয়ালে অর্থসহ নতুন শব্দ

এবং বিশ্লেষণসহ যুক্তবর্ণের তালিকা দেয়ালে টানিয়ে রাখতে পারেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণের দেয়াল-তালিকা শিক্ষার্থীদের শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখনকে সহজ ও কার্যকর করতে সহায়তা করবে। নতুন পাঠের সংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিক্ষক নিয়মিত তালিকায় যুক্ত করতে পারেন।

৩. অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের পর্যায়। এ পর্যায়ে অর্জিত শিখনের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় লিখবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী মুক্তভাবে নিজের ভাষায় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখবে। পাঠের উন্নত লেখার সাথে এ ধরনের লেখার পার্থক্য হলো, এ লেখা শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন ও অভিজ্ঞতা নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে লেখায় নিজের জানা শব্দ ব্যবহারের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীকে পাঠে পড়ানো হয়নি এমন শব্দও যদি শিক্ষার্থী এ ধরনের লেখায় ব্যবহার করে তবে কোনো অসুবিধা নেই। লেখায় সৃজনশীলতার জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষক প্রশংসন করবেন। লেখায় বানান ভুল করলে সংশোধনের জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষক সুযোগ দেবেন। বানান শুন্দ হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রশংসন করবেন।

শিক্ষার্থী যখন নিজের ভাষায় লেখা শেষ করবে শিক্ষক তখন তা সরবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাথে লেখা বিনিময় করবে এবং একে অপরের লেখা সরবে পড়বে।

ভাষা-শিখনের প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন উদ্দেশ্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সে জন্য শিখন-কর্মকাণ্ডে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করাবেন। ভাষাদক্ষতা শিখনের ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই সামগ্রিক ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দক্ষতা অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করবেন। ভাষা শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডগুলি যাতে যৌক্তিক হয়, শিক্ষককে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের ভাষা শিখনে যাতে সহায়ক হয় শিক্ষক সে ব্যাপারে যত্নবান হবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মাঝে সংগঠিত সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ড ভাষা-শিখনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই ভাষা-শিখন-শেখানোর সকল ক্ষেত্রে শিক্ষক মিথস্ক্রিয়ামূলক (interactive) কর্মকাণ্ড পরিচলনা করবেন যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অবাধ সুযোগ থাকবে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক একটি সক্রিয় শিখন পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীর জীবনস্থিতি প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে ভাষা-শিখন শিক্ষার্থীদের বাস্তবমূর্তি ও কার্যকর ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।



সূচিপত্র

বিষয়

	পৃষ্ঠা
১. এই দেশ এই মানুষ	১
২. সংকলন	৬
৩. সুন্দরবনের থাণী	১০
৪. হাতি আৰু শিল্পালোর গুৰু	১৬
৫. ঝুটিবল খেলোজীড়	২২
৬. বীজের রাজ্ঞী স্বাধীন এ দেশ	২৪
৭. কেন্দ্ৰীয়ৰ পান	৩১
৮. শহৈৱ সূৰ্যশিখ	৩৪
৯. শব্দবৃণ্ণ	৪১
১০. অৱশীম বীৱা চিৰদিন	৪৪
১১. অদেশ	৫০
১২. কাঁকলমালা আৰু কীকলমালা	৫৬
১৩. অবাক অলগুল	৬৪
১৪. ঘাসকূল	৭৩
১৫. মাটিৰ নিতু বে শুভা	৭৬
১৬. শিকাশুৰুৰ মৰ্মাদা	৮১
১৭. তামুক ছেলেটি	৮৫
১৮. সুই তীক্ষ্ণ	৯১
১৯. বিদায় হজ	৯৫
২০. দেখে এলাম নামায়া	১০১
২১. গৌজু দেখে জয়	১০৬
২২. অওলালা আকলুণ হামিদ খান তাসামী	১০৯
২৩. শহিদ তিকুলীৰ	১১৫
২৪. অপোকা	১২০
● শহৈৱ অৰ্প জেনে পিৰু	১৩০

এই দেশ এই মানুষ

“সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে” কবিতা এ কথার অর্থ— আমাদের সৌভাগ্য ও সার্থকতা যে আমরা এদেশে জন্মেছি। আমরা বাঙালি। বাংলাদেশের প্রায় সকল লোক বাঙালী কথা বলে। তবে আমাদের দেশে যেমন রয়েছে প্রকৃতির বৈচিত্র্য, তেমনি রয়েছে মানুষ ও ভাষার বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন কুন্ত জাতিসম্বাব লোকজন। এদের কেউ চাকমা, কেউ মাঝমা, কেউ মুরং, কেউ তৎজাইত্যাদি। এছাড়া রাজশাহী আর জামালপুরে রয়েছে সৌওতাল ও রাজবল্লীদের বসবাস। ভাদের রয়েছে নিজ নিজ ভাষা। একই দেশ অর্থ কর বৈচিত্র্য। এটাই বাংলাদেশের গৌরব। সবাই সবার কন্তু, আপনজন। এদেশে রয়েছে নানা ধর্মের লোক। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। সবাই যিলেখিশে আছে বৃগু যুগ ধরে। এরকম খুব কম দেশেই আছে। আবার আমাদের বাংলাদেশের বাইরেও অনেক বাঙালি আছে।



বালাদেশের এই যে মানুষ, তাদের পেশাও কত বিচ্ছিন্ন। কেউ জেলে, কেউ কুমার, কেউ কৃষক, কেউ আবার কাজ করে অফিস-আদালতে। সবাই আমরা পরস্পরের বন্ধু। একজন তার কাজ দিয়ে আরেকজনকে সাহায্য করছে। গড়ে ভূলছে এই দেশ।

ভাবো তো কৃষকের কথা। তারা কাজ না করলে আমাদের খাদ্য জোগাত কে? সবাইকে তাই আমাদের প্রস্তা করতে হবে, ভালোবাসতে হবে। সবাই আমাদের আপনজন।

আমাদের আছে নানা ধরনের উৎসব। মুসলিমদের রঞ্জেছে দুটি ঈদ, ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা। হিন্দুদের দুর্গা পুজাসহ আছে নানা উৎসব আর পার্বণ। বৌদ্ধদের আছে বৃদ্ধ পুর্ণিমা। শ্রিষ্টানদের আছে ইস্টার সানডে আর বড় দিন। এছাড়াও রঞ্জেছে নানা উৎসব। পহেলা বৈশাখ- নববর্ষের উৎসব। রঞ্জেছে ইন্দুইনদের সাহ্যাই ও চাকমাদের বিজু উৎসব। ধর্ম যার যার, উৎসব যেন সবার।



পহেলা বৈশাখের উৎসব



পর্বত মেলার অবস্থা

গোশাক-গরিজনও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন ভিন্ন ধাচের। যিল আমাদের একটা জাগুগাম-সকলেই আমরা বালাদেশের অধিবাসী।

বালাদেশের প্রকৃতি ও জনজীবন ভাই ভাই বৈচিত্র্যময়। এই দেশকে ভাই ঘূরে ঘূরে দেখা দরকার। কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায়-বা এর সমুদ্রের কেলাভূমি। এজন্য দেশের নানা প্রান্ত যেমন ঘূরে দেখা দরকার তেমনি দরকার আজীব্য-অজ্ঞ ও বন্দুদের বাঢ়ি বেড়াতে যাওয়া, পরস্পর মেলামেশা করা। কাছাকাছি আসা, মানুষকে ভালোবাসা।

দেশ মালে এর মানুষ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র— এইসব। দেশ হলো জননীর মতো। জননী যেমন দেহ, মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখেন। দেশও তেমনই ভাই আলো, বাতাস ও সম্পদ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখেছে। এদেশকে আমরা ভালোবাসব।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

সৌভাগ্য প্রকৃতি বৈচিত্র্য বেলাভূমি প্রান্তর স্বজন সার্থক সাংগ্রাহী বিজু

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রকৃতি সৌভাগ্য বৈচিত্র্য বেলাভূমি প্রান্তর সার্থক

ক. আমাদের যে আমরা এদেশে জন্মেছি।

খ. আমাদের দেশে রয়েছে সুন্দর।

গ. কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায়-বা এর সমুদ্রের।

ঘ. একই দেশ অর্থচ কত।

ঙ. দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, , পাহাড়, সমুদ্র- এইসব।

চ. দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়া আর কারা বাস করে?

খ. বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের উৎসবগুলোর নাম কী?

গ. বাংলাদেশের জনজীবনের বৈচিত্র্যসমূহ কী কী?

ঘ. “দেশ হলো জননীর মতো।” দেশকে জননীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?

ঙ. জেলেদের পেশা কী? তারা যদি কাজ না করে তাহলে আমাদের কী হতে পারে?

চ. “ধর্ম যার যার, উৎসব যেন সবার।” – এ কথার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ছ. দেশকে কেন ভালোবাসতে হবে?

৪. নিচের অনুচ্ছেদ অবলম্বনে তিটি প্রশ্ন তৈরি করি।

দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র- এইসব। দেশ হলো জননীর মতো। মা যেমন আমাদের দ্রেহমতা, ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখেন, দেশও তেমনই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এ দেশকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সার্থক হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

৫. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বাঙালি | অবাঙালি

বন্ধু | শত্রু

দেশ | বিদেশ

সার্থকতা | ব্যর্থতা

ক. আমাদের বাংলাদেশের বাইরেও অনেক আছে।

খ. আমরা সবাই পরস্পরের.....।

গ. হলো জননীর মতো।

ঘ. আমাদের যে আমরা এদেশে জন্মেছি।

৬. নিচের বাক্য কয়টি পড়ি।

মনির খুব ভালো ছেলে। রবিন তার বন্ধু। মনির ও রবিন একত্রে মাঠে খেলে।

এখানে,	মনির, রবিন	- বিশেষ্য পদ
খুব ভালো	- বিশেষণ পদ	
তার	- সর্বনাম পদ	
ও	- অব্যয় পদ	
খেলে	- ক্রিয়া পদ	

এবার নিচের বাক্য কয়টি থেকে ৫ ধরনের পদ খুঁজে বের করি।

“বাংলাদেশের জনজীবন ভারি বৈচিত্র্যময়। এই দেশকে তাই ঘুরে ঘুরে দেখা দরকার। এজন্য দরকার দেশের নানা প্রান্তে আত্মায়-স্বজন ও বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া। উচিত সবার সবাইকে ভালোবাসা।”

৭. কর্ম-অনুশীলন।

ক. বাংলাদেশের যেকোনো উৎসব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি।

খ. শিক্ষকের নির্দেশনায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে (৩ দিন/৪ দিন পরপর)

টেলিভিশন/রেডিও/খবরের কাগজে প্রচারিত সংবাদ দেখে/শুনে/পড়ে নিচের ছক অনুযায়ী আলাদা কাগজে তা লিখে আনি। পরে শ্রেণিতে পড়ে শোনাই ও অন্যদের লেখা শুনি।

তারিখ	আনন্দের সংবাদ	দুঃখের সংবাদ	খেলার সংবাদ

সংকলন

কাজী নজরুল ইসলাম

থাকব না কো বজ্জ ঘরে
 দেখব এবাব জগত্তাকে,-
 কেমন করে সুরহে মানুষ
 সুগান্ধিরে সুর্পিশাকে ।
 দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
 ছুটছে তারা কেমন করে,
 কিসের লেশায় কেমন করে
 মরহে যে বীর শাখে শাখে,
 কিসের আশায় করহে তারা
 বয়ণ মরণ-যন্ত্রিকে ॥

হাউই চড়ে চায় যেতে কে
 চন্দ্রলোকের অচিন্পুরো;
 শূন্ব আমি, ইঙ্গিত কোন্
 মঙ্গল হতে আসছে উড়ে ॥
 পাতাল ফেড়ে নামব নিচে
 উঠব আবাব আকাশ ঝুঁড়ে;
 বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি
 আপন হাতের মুঠোর পুরে ॥

(সংকলিত)



অনুশীলনী

১. বিভিন্ন মূলভাব জেনে নিই।

অসীম বিশ্বকে জানতে এক অসম্য ক্ষেত্ৰহীন মানুষের। কিশোরেরও তাই। সে জানতে চায় বিশ্বের সকল কিছুকে। আবিষ্কার করতে চায় অসীম আকাশের সকল অজানা গহণ্যকে। সে বুঝতে চায় কেন মানুষ ছুটছে অসীমে, অতলে, অভূতীক্ষে। বীর কেন জীবনকে অনায়াসে বিপন্ন করে, কেন বরণ করে মৃত্যুকে। সে জানতে চায় দুঃসাহসী কেন উড়ছে। তাই কিশোর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে—সে বন্ধ ঘোরে বসে থাকবে না। পৃথিবীটাকে সেও সুন্দর সুন্দর দেখবে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

সংক্রান্ত বন্ধ যুগান্তর দেশান্তর বরণ মরণ-যজ্ঞপা চন্দ্রলোক
অচিনপুর ফেড়ে



৩. একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ শিখি ও বাক্য তৈরি করি।

সংকল্প	-	প্রতিজ্ঞা	ভালো কাজের জন্য সবাইকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা উচিত।
বন্ধ	-	বন্ধ	ইঙ্গিত
দেশান্তর	-	অন্যদেশ	বরণ
জগৎ	-	পৃথিবী	সাদরে গহণ

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. কবি বন্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন?
- খ. যুগান্তরের ঘৰ্ণিঙ্গাকে মানুষ ঘুরছে বলতে কী বোঝা লেখ?
- গ. চন্দ্রগুলোকের অচিনপুরে কারা যেতে চায়?
- ঘ. কিসের আশায় বীর মরণকে বরণ করছে?
- ঙ. কবি হাতের মুঠোয় পুরে কী এবং কেন দেখতে চান?

৫. ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপ শিখি।

চলিত রূপ	সাধু রূপ	চলিত রূপ	সাধু রূপ
ঁাকিব	ঁাকিব	ছুটছে	ছুটিতেছে
দেখিব	দেখিব	আসছে	আসিতেছে
ঘুরিছে	ঘুরিতেছে	চলছে	চলিতেছে
মরিছে	মরিতেছে		

৬. ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে জেনে নিই।

- ক. আমি কাজটি করি।
আমি কাজটি করেছিলাম।
আমি কাজটি করব।

উপরের বাক্যগুলোতে ব্যবহৃত করি, করেছিলাম ও করব – এগুলো ‘করা’ ক্রিয়াপদটির বিভিন্নরূপ।
যে সময়ে ক্রিয়া বা কাজটি সম্পন্ন হয় সেই সময়টিকেই ক্রিয়ার কাল বোঝানো হয়েছে।
যেমন বর্তমান কাল, অতীত কাল, ভবিষ্যৎ কাল।

- খ. নিচের বাক্যের ক্রিয়াবাচক শব্দগুলোর নিচে দাগ দিই।
আমি বড় হয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।
আমি আমার দক্ষতা অন্যের উপকারে ব্যবহার করি।

কিশোর বর্ষাকালে তার প্রায়ে পাহ লাগাবে।

তরুণ চিকিৎসক হবে। মানুষের চিকিৎসা করবে।

(গ) নিচের ভবিষ্যৎ কালবাচক ক্রিয়াপদগুলোকে বর্তমান ও অতীত কালবাচক ক্রিয়াপদে
যুগান্তর করি

ধাক্ক, দেখ্ব, শুন্ব, থাব, বেড়াব, স্মৃব, পড়ব, খেলব, ঢেড়ব, নামব, ধৱব, হাসব

ভবিষ্যৎ

বর্তমান

অতীত

ধাক্ক

ধাকি

ধেকেছিলাম

৭. শব্দগুলোর বাদান শিখি।

বরশ, মরশ, বঙ্গশা (ঝ-এর পরে ‘ং’ বসে), বন্ধ, যুগান্তর, দেশান্তর, বিশ্বজগৎ,
ইতিহাস।

৮. কবিতা সংকলনগুলো শিখি।

৯. আমার সংকলনগুলো শিখি।

১০. কবিতাটি আবৃষ্টি করি ও মুক্ত্য শিখি।



কবি-গরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম পঞ্চমবঙ্গের বর্দমান জেলার ছয়শিলা
প্রায়ে জন্মাইগ করেন। তাঁর জন্মতারিখ ২৫শে মে, ১৮৯৯
খ্রিষ্টাব্দ,(১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সন)। তিনি বিদ্রোহী কবি নামেই
বেশি পরিচিত। তিনি বাঙাদেশের জাতীয় কবি।

তাঁর কবিতা, গান, গীত, নাটক, উপন্যাস আমাদের সাহিত্যের
অমূল্য সম্পদ। শিশুদের জন্য তিনি অনেক গান, কবিতা, ছড়া
ও নাটক লিখেছেন। ‘অঙ্গীকী’, ‘বিশ্বের বৌশী’, ‘বিশ্বে কূল’ তাঁর
বিখ্যাত কাব্যলক্ষ্মী। তিনি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট, (১২ই
জ্যোতি ১৩৮৩ সন) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কাজী নজরুল
ইসলাম

সুন্দরবনের প্রাণী

বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে প্রকৃতির অপার সঞ্চাল সুন্দরবন। সমুদ্রের কোল থেকে গড়ে উঠেছে এই বিশাল বন। এখানে রয়েছে যেমন অচুর গাছগালা, কেওড়া ও সুন্দরী গাছের বন, তেমনি রয়েছে নানা প্রাণী, জীবজীব।



রাঙাল বেঙাল টাইগার

বিশ্বের কোনো কেনো প্রাণীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের নাম বা জাতীয়ত্বের নাম। যেমন, ক্যাঞ্চারু বললেই যন্তে পড়ে যাব অন্তর্দিশিয়ার কথা। সিহ বললেই যন্তে ভেসে উঠে আক্রিকার কথা। তেমনি বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রংপুর বেঙাল টাইগার বা রাজকীয় বাঘের নাম। এই বাঘ থাকে সুন্দরবনে। এ বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি আবার ভয়ঙ্কর। এর চালচলনও রাজাৰ মতো। সুন্দরবনের ভেজা সাঁতসৈতে পোলপাতার বনে এ বাঘ ঘূরে বেড়ায়।

শিকার করে জীবজন্ম, সুযোগ পেলে মানুষও খায়। এক সময় সুদূরবনে ছিল চিতাবাঘ ও তলবাঘ। কিন্তু এখন আর এসব বাঘ দেখা যায় না। সুদূরবনের রয়েছে বেঙাল টাইগার বাংলাদেশের অন্যত্য সম্মান। এ বাঘকে বিলুপ্তির হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে হবে।

সুদূরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ। কোনোটার বড় বড় শিৎ, কোনোটার গায়ে ফেঁটা ফেঁটা সাদা দাগ। এদের বলে চিত্রা হরিণ। এক সময় সুদূরবনে প্রচুর পঞ্চাঙ্গ ছিল, ছিল হাতি, ছিল বুনো শুয়োর। এখন এসব প্রাণী আর নেই। তবে দেশের রাষ্ট্রামাটি আর বাস্তবান্বের জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়।

যেকোনো দেশের জন্যই জীবজন্ম, পশুপাখি এক অন্যত্য সম্মান। দেশের জলবায়ু আবহাওয়া গাছপালা বৃক্ষলতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলেই সে দেশের প্রাণিকূল জীবনধারণ করে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে পৃথিবীতে অপর্যাপ্তিময় প্রাণী বা বৃক্ষলতা বলতে কিছুই নেই। একসময় আমাদের দেশে প্রচুর শক্তি দেখা যেত। শক্তি দেখতে যে খুব সুদূর পাখি তা কিন্তু নয়। এরা উড়ে বেড়ার আকাশের অনেক উপরে। বাসা করে গাছের ডালে। মানুষের পক্ষে ধা ক্ষতিকর, সেইসব আবর্জনা শক্তি খায় এবং পরিবেশকে পরিষ্কার রাখে। কিন্তু শক্তি এখন বাংলাদেশে বিলুপ্তপ্রায় পার্খি।

প্রাণী বৃক্ষলতা সব কিছুই প্রকৃতির দান। তাকে ধ্যাস করতে নেই। ধ্যাস করলে নেমে আসে নানা বিপর্যয়—বন্যা, খরা, বড় ইত্যাদি।



চিত্রা হরিণ



পাহাৰ



হাতি



শ্বেত



অদল টাক



কলা শুয়োর

পশুগাছি ও জীবজন্ম প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। প্রকৃতিতে যদি বিপর্যয় ঘটে তবে এদের জীবনও বিপর্যয় হয়। সূন্দরবনের অনেক আধী প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে বিলুপ্ত হয়ে পেছে। যেসব আধী আছে তাদের বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অপার সম্ভার রয়েল ভয়ঙ্কর অমূল্য বিলুপ্তপ্রায়

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অমূল্য অপার সম্ভার রয়েল ভয়ঙ্কর বিলুপ্তপ্রায়

ক. বাংলাদেশ সৌন্দর্যে ভরপুর।

খ. প্রকৃতির অপার সমুদ্রের নিচে রয়েছে।

গ. বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বেঙ্গল টাইগার।

ঘ. বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি আবার।

ঙ. রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের সম্পদ।

চ. শকুন বাংলাদেশে এখন পাখি।

৩. কথাগুলো বুঝে নিই।

অস্ট্রেলিয়া	এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মতো একটি মহাদেশ।
ক্যাঙ্গারু	একমাত্র অস্ট্রেলিয়াতেই পাওয়া যায় এমন একটি প্রাণী। এদের চারটি পা, কিন্তু পেছনের দু-পা বড় আর সামনের দু-পা ছোট। এর ফলে অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীর মতো এরা হাঁটাচলা করতে পারে না, পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ক্যাঙ্গারু তার বুকের নিচে একটা থলিতে বাচ্চা রাখে।
চিতাবাঘ	এক প্রকার বাঘ। অন্য বাঘের সঙ্গে চিতাবাঘের পার্থক্য। চিতাবাঘ অন্যান্য বাঘের চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে ও গাছে উঠতে পারে।
গণ্ডার	কালো ও ধূসর রঙের চতুষ্পদ প্রাণী, উচ্চতায় ও লম্বায় গরুর আকারের। এদের নাকের ওপরে শিং থাকে।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. ক্যাঞ্জারু ও সিংহ বললেই কোন কোন দেশের কথা মনে হয় ?
খ. বিভিন্ন ধরনের বাঘ সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।
গ. দেশের জন্য পশুপাখি, জীবজন্ম কী উপকার করে তা নিজের ভাষায় লেখ।
ঘ. শকুন কীভাবে মানুষের উপকার করে ?
ঙ. পশুপাখি জীবজন্ম না থাকলে প্রকৃতির কী বিপর্যয় ঘটবে বলে তোমার মনে হয় ?

৫. নিচের বাক্য দুটি পড়ি।

মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকর সেইসব আবর্জনা শকুন খেয়ে ফেলে। সে সত্যিকার অর্থে মানুষের উপকার ছাড়া অপকার করে না।

উপরের বাক্য দুটিতে অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই এক-একটি পদ :

শকুন	বিশেষ পদ
ক্ষতিকর	বিশেষণ পদ
সে	সর্বনাম পদ
খায়	ক্রিয়া পদ
ছাড়া	অব্যয় পদ

ପଦ ପୀଠ ପ୍ରକାର: ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା, ଅବ୍ୟାୟ ।

নিচের বাক্যগুলোতে কী কী পদ আছে তা লেখ।

সুন্দরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ। কোনোটার বড় বড় শিৎ, কোনোটার গায়ে
ফেঁটা ফেঁটা সাদা দাগ। এদের বলে চিত্রা হরিণ।

৬. নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তাদেশের যেকোনো একটি প্রাণী সম্পর্কে রচনা লিখি।

৭. ঠিক উভয়টিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. ব্যাঙ্গালুর বললেই মনে পড়ে যে দেশের কথা-

- | | |
|-----------------|-------------|
| ১. ভারত | ২. বাংলাদেশ |
| ৩. অস্ট্রেলিয়া | ৪. আফ্রিকা |

খ. আফ্রিকার কথা উঠলে কোন প্রাণীর কথা মনে হয়?

- | | |
|---------|---------|
| ১. সিংহ | ২. হাতি |
| ৩. বাঘ | ৪. উট |

গ. বাংলাদেশের কোন জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়?

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| ১. সিলেট ও খুলনার | ২. ভাওয়াল ও মধুপুরের |
| ৩. রাঙামাটি ও বান্দরবানের | ৪. উপরের সবখানে |

ঘ. কোন পাখি ক্ষতিকর আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিছন্ন রাখে?

- | | |
|--------|---------|
| ১. ঈগল | ২. শকুন |
| ৩. চিল | ৪. কাক |

ঙ. কোন প্রাণীর গায়ে ফেঁটা ফেঁটা সাদা দাগ ও বড় শিং আছে?

- | | |
|-------------|----------------|
| ১. চিতা বাঘ | ২. চিত্রা হরিণ |
| ৩. ভালুক | ৪. গণ্ডার |

৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমি এমন প্রাণীদের একটি তালিকা তৈরি করি- যাদের নাম শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি।
পরে শ্রেণির স্বার সাথে তা মিলিয়ে দেখি।

ହତି ଆର ଶିଆଲେର ଗତ

ଦେ ଅନେକ-ଅନେକ ଦିନ ଆଗେର କଥା । ଚାରଦିକେ ତଥନ କୀ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ବନ, ବୋପବାଢ଼ । ଆର ଦିଗଭେ ଦୁଇକେ ପଡ଼ା ନୀଳ ଆକାଶେର ଛୋଯା । ଏଇକମ ଦିନଗୁଲୋତେ ମାନୁଷେରା ଧାକତ ଲୋକଙ୍କରେ ଆର ପଶୁରା ଜଞ୍ଜାଲେ ।

ମାନୁଷ ତଥନ ଏକଟୁ ଏକଟୁ କରେ ସଭ୍ୟ ହଜେ । କୀ କରେ ସବାର ସଜ୍ଜେ ମିଳେମିଶେ ଥାକା ଯାଇ, ଶିଖରେ ସେଇସବ କାଯଦାକାନୁନ । ଓ-ଦିକେ ବଲେ ବଲେ ତଥନ ପଶୁଦେର ରାଜତ୍ତ । ହାଜାର ରକମେର ଥାଣୀ, ଅସଂଖ୍ୟ ପାଖ-ପାଖାଳି । ବେଶ ଶାନ୍ତିଭେଇ କାଟାଇଲ ବଲେର ପାରି ଆର ଥାଣୀଦେର ଦିନଗୁଲୋ । କିମ୍ବା ଏକଦିନ ହଲୋ କି ତାଡ଼ା ଥେରେ ମନ୍ତ ଏକଟା ହତି ଏହି ବଲେ ଦୁଇକେ ପଡ଼ିଲ । ହତିଟାର ସେ-କୀ ବିଶାଳ ଶରୀର । ପାଶୁଲୋ ବଟପାକୁଡ଼ ଗାହେର ମତୋ ମୋଟା । ଶୁଭ୍ର ଏତଟାଇ ଲମ୍ବା ଯେ ଆକାଶେର ଗାୟେ ଗିଯ଼େ ବୁଝି ଠେକବେ । ତାର ଗାୟେତ ଅସୀମ ଜୋର । ଏହି ଶରୀର ଆର ଶକ୍ତି ନିଯେଇ ତାର ଯତ ଅହକୋର । ମେଜାଜଟାଓ ଦାରୁଣ ତିରିକି ।



তো-যেই-না হাতিটার ঐ বনে ঢোকা, অমনি শুরু হয়ে গেল তোলপাড়। নতুন অতিথি এসেছে, সবাই স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু ঐ দুষ্ট হাতিটার সে-কী তুলকালাম কাও! খুব জোরে গলা ফাটিয়ে দিল প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার। থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত বন। গাছে গাছে পরম নিশ্চিন্তে বসেছিল পাখি, তারা ভয়ে ডানা ঝাপটাতে শুরু করল। মাটির তলায় লুকিয়ে ছিল যে ইদুর, গুব্রে পোকার দল। তারা বুঝতে চাইল কী এমন ঘটল যে এমন করে কেঁপে উঠল মেদিনী?

হাতিটা এমন ভাব করতে শুরু করল, সেই বুঝি বনের রাজা। গুরুগন্ধীর ভারিকি চালের কেশের দোলানো অমিত শক্তিধর সিংহ। সেও হাতিটার কাছে আসতে ভয় পায়। হালুম বাঘ মামা, সেও হাতিটার ধারে-কাছে ঘেঁষতে চায় না। বনের সবাই ভয়ে তটস্থ, শক্তিকৃত। কখন জানি কী হয়!

একবার তো কী জানি কী হয়েছে। নিরীহ একটা হরিণকে শুঁড়ে জড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। আরেকবার ছেউ একটা পিপড়ে পায়ের তলায় পিয়ে মেরে ফেলল। সেই থেকে বনের কোনো প্রাণী হাতিটার ছায়াও মাড়াত না। দিনে দিনে হাতিটা হয়ে উঠল আরও অহংকারী। এই নিয়ে বনের কারো মনে শান্তি নেই।

কিন্তু এভাবে কি দিন যায়? এক সন্ধিয়ায় বনের সব প্রাণী এসে জড়ো হলো সিংহের গুহায়। এর একটা বিহিত চাই, সবার মুখে এক কথা। বাঘ, তালুক, সিংহ, বানর, হরিণ, বনবিড়াল, শিয়াল সবাই সলা-পরামর্শ করতে বসল। শেষে সবাই মিলে শিয়ালের উপরেই ভার দিল।

দিন আসে, দিন যায়। একদিন শিয়াল ভয়ে ভয়ে হাজির হলো হাতির আস্তানায়। লেজ গুটিয়ে একটা সালাম দিল। বলল, আপনিই তো বনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী। আপনিই আমাদের রাজা। ওই দেখুন, নদীর ওপারে সবাই উদগ্রীব হয়ে বসে আছে। আপনাকে রাজা হিসেবে বরণ করে নিতে চায় সবাই।

হাতি তো শিয়ালের কথা শুনে মহা খুশি। আচ্ছা চল। নদীর পারে এসে শিয়াল বলল, এই আমি নদী সাঁতরে পার হচ্ছি। আপনিও আসুন। এই বলে শিয়াল নদীতে দিল ঝাঁপ। হাতি ভাবল, পুঁচকে শিয়াল যদি নদী পার হতে পারে, আমি পারব না কেন? সেও নদীতে নেমে পড়ল।

কিন্তু মন্ত বড় তার শরীর আর কী ভারী! হাতিটা নদীর পানিতে পা দিল। অমনি তার ভারী শরীর একটু একটু করে তলিয়ে যেতে থাকল। তলিয়ে যেতে যেতে হাতি বলল, শিয়াল ভায়া, আমাকে বাঁচাও। শিয়াল ততক্ষণে নদী পার হয়ে তীরে উঠে এসেছে। বনের সমস্ত প্রাণী তার পেছনে এসে দাঁড়াল।

শিয়াল হাতিকে কাল, তোমাকে বাঁচাব আমরা? এতদিন তোমার অত্যাচারে আমরা কেউ বলে
শান্তিতে দুমাতে পারিনি। তোমাকে শান্তি দেওয়ার জন্যেই তো নদীতে নিয়ে এসেছি। বনের
যত প্রাণী ছিল, সবাই শিয়ালের কথার প্রতিধ্বনি করে সমন্বয়ে বলে উঠল :

ঠিক বলেছ শিয়াল ভাঙা
আৱ দেখব না হাতিৰ ছাঙা
আমৰা এখন মুক্ত আধীন
নাচছি সবাই তা ধিন তা ধিন।

(হিতোপদেশ অবলম্বনে)



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দিগন্ত অহংকার তিরিক্ষি তুলকালাম কাণ্ড হুঙ্কার মেদিনী তটস্থ শক্তিত
শক্তিধর আস্তানা উদগ্রীব সমষ্টিরে

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দিগন্তের অহংকার তিরিক্ষি তুলকালাম কাণ্ড হুঙ্কার মেদিনী তটস্থ শক্তিত

ক. বিদ্যুৎ চমকালে কেঁপে ওঠে বলে মনে হতে পারে।

খ. পতনের মূল।

গ. কী হয়েছে, এত হয়ে আছ কেন?

ঘ. বনের সিংহ দিলে মানুষের মনে ভয় জাগে।

ঙ. নিজের কলমটা খুঁজে না পেয়ে সে বাধিয়ে দিয়েছে।

চ. ওপারে কী আছে কেউ জানে না।

ছ. মেজাজ বলে তার কাছে কেউ ঘেঁষতে চায় না।

জ. তুমি এত কেন? কী হয়েছে?

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. অমিত শক্তিধর কাকে বলা হয়েছে?

খ. বনের পশুদের ওপর অশান্তি নেমে আসার কারণ কী?

গ. গল্পে মুক্ত স্বাধীন বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ঘ. শিয়াল হাতিকে শাস্তি না দিলে বনের পশুপাখিদের কী হতো ব্যাখ্যা কর।

ঙ. হাতির এই শাস্তির জন্য তার চরিত্রের কোন বিষয়গুলো দায়ী বলে তুমি মনে কর।

চ. মানুষ যখন সভ্য হচ্ছে তখন মিলেমিশে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন?

ছ. সবাই মিলে শিয়ালকে দায়িত্ব দিল কেন?

জ. শিয়াল কীভাবে বনের পশুপাখিকে রক্ষা করলো?

ঝ. অহংকারী ও অত্যাচারীর পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হয়?

৪. বিশ্বীত শব্দ জেনে নিই। খালি জাহাগীর ঠিক শব্দ বিশিষ্টে বাক্য তৈরি করি।

সুন্দর	কুৎসিত	অহংকার	নিরহংকার	ভৱ	সাহস	স্বাধীন	প্রাধীন
--------	--------	--------	----------	----	------	---------	---------

ক. আমরা দেশের অধিবাসী।

খ. পাতনের মূল।

গ. চেহারা নয়, আসল হলো মানুষের মূল।

ঘ. ঘনে থাকলে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়।

৫. ঠিক উচ্চাটিতে ঠিক (✓) চিহ্ন নিই।

ক. বনের সব প্রাণী কার কাছে এসে জড়ো হলো?

- | | |
|---------|-----------|
| ১. বাঘ | ২. শিয়াল |
| ৩. হাতি | ৪. সিংহ |

খ. কার জন্য বনে আবার শাস্তি এসে?

- | | |
|----------|-----------|
| ১. সিংহ | ২. শিয়াল |
| ৩. ভালুক | ৪. বাঘ |

গ. হাতির অভ্যাচার থেকে বাচার জন্য কেন শিয়ালকে দায়িত্ব দেয়া হলো?

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| ১. শিয়াল সৌভাগ্য জানে | ২. শিয়াল খুব সাহসী |
| ৩. শিয়াল বুদ্ধিমান | ৪. শিয়াল হাতির বন্ধু |

ঘ. হাতির করুণ পরিপত্তির জন্য দায়ী কোনটি?

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ১. হাতির অহংকার | ২. হাতির লম্বা শুঁড় |
| ৩. হাতির ভালী শরীর | ৪. হাতির বোকায়ি |

ঙ. হাতিকে বাচানোর জন্য কেউ এশিয়ে এসে না কেন?

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ১. হাতির অভ্যাচারের জন্য | ২. হাতি খুব বড় বলে |
| ৩. হাতির ভয়ে | ৪. হাতি সৌভাগ্য জানে বলে |



৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

শান্তি	অশান্তি	অসৎ প্রতিবেশীর কারণে তার অশান্তি লেগেই আছে।
সভ্য
ধৰনি
শক্তিশালী

৭. নিচের শব্দগুলোর কোনটি কোন পদ লিখি।

দুষ্টু	-	বিশেষণ
হাতি	-	
বৃদ্ধিমান	-	
এবং	-	
আমি	-	
চায়	-	

৮. যেকোনো একটা প্রাণী সম্পর্কে বলি এবং পৌঁছাটি বাক্যের একটা অনুচ্ছেদ রচনা করি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

একটি গল্প লেখার চেষ্টা করি। প্রথমে শিক্ষকের সহায়তায় ২/৩টি সাদা কাগজ নিই। সেগুলোকে একটি ভাঁজ করে নোটবুকের মতো তৈরি করি। এখন প্রতিটি কাগজের এক পাশে নিচের দিকের অর্ধেক থেকে গল্প লেখা শুরু করি। আর উপরের অর্ধেকে নিজের খুশিমতো ছবি আঁকি। লেখা শেষে উপরে একটা কভার পৃষ্ঠা যোগ করি। সে-পৃষ্ঠায় গল্পের একটা নাম দিই ও লিখি, নিজের নাম লিখি এবং ইচ্ছামতো ছবি আঁকি। এভাবে নিজের লেখা একটি গল্পের বই তৈরি করি।

ফুটবল খেলোয়াড়

জসীম উদ্দীন



আমাদের মেসে ইমদাদ হক ফুটবল খেলোয়াড়,
হাতে পায়ে শূধু শত আঘাতের ক্ষতে ধ্যাতি শেখা তার।
সম্ব্যাকেলায় দেখিবে তাহারে পটি বাধি পায়ে হাতে,
মালিশ মাথিছে প্রতি গিটে গিটে কাত হয়ে বিছানাতে।
মেসের চাকর হয় লবেজান সেই দিতে ভাঙ্গা হাড়ে,
সারা রাত শুধু ছটফট করে কেন্দে কেন্দে ডাক ছাড়ে।
আমরা তো ভাবি হ মাসের তরে পজু সে হলো হায়,
ফুটবল-টিমে বল লয়ে কভু দেখিতে পাব না তায়।

প্রভাত বেলায় ব্যবর লইতে ছুটে যাই তার ঘরে,
বিছানা তাহার শূন্য পড়িয়া ভাঙ্গা খাটিরায় পরে।
টেবিলের পরে ছেট বড় বড় মালিশের শিলিগুলি,
উগহাস ঘেন করিতেছে মোরে ছিপি-পরা দাত ভূলি।
সম্ব্যাকেলায় খেলার মাঠেতে চেয়ে দেখি বিদ্যুয়ে,
মোদের মেসের ইমদাদ হক আগে ছুটে বল শয়ে।

বাম পায়ে বল দ্বিবিলি করে ভাল পারে মারে টেলা,
ভাঙ্গা করুখানা হাতে পারে তার বস্তু করিছে খেলা।
চালাও চালাও আরো আগে বাও বাতাসের আগে থাও,
মারো জোরে মারো-গোলের তিতেরে বলেরে ঝুঁড়িয়া দাও।
গোল-গোল-গোল, চারদিক হতে ওঠে কোলাহলকল,
জীবনের পশ, মরণের পশ, সব বাধা পারে দল।
গোল-গোল-গোল—মোদের মেসের ইমদাদ হক কাঞ্জি,
ভাঙ্গা দুটি পায়ে জন্মের ভাণ্ড লুটিয়া আনিল আঞ্জি।
দর্শকদল ফিরিয়া চলেছে মহা-কলরব করে।
ইমদাদ হক খৌড়াতে খৌড়াতে আসে বে মেসের ঘরে।
মেসের চাকর হয়রান হয় পারেতে মালিশ মাথি,
বেশুম রাত্রি কেটে শায় তার টিক্কার করি ডাকি।
সকালে সকালে দৈনিক খুলি মহা-কলরবে পড়ে,
ইমদাদ হক কাল যা খেলেছে কমই তা নজরে পড়ে।

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

জাত খেলোয়াড় ইমদাদ হক। খেলা এবং খেলায় জেতাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিজের অবস্থা যেমনই হোক না কেন খেলা-পাগল সে, খেলবেই। খেলতে গিয়ে ইমদাদ কত শত আঘাত পায়। তবু সেসব কষ্টকে পরোয়া না করে সে খেলে এবং তার জন্যই খেলায় জিত আসে। তার জন্যই সকল দর্শক খেলার আনন্দ পায়। এই কবিতায় খেলাছলে একটি আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে। তা হলো, নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে মানুষ যদি একান্তভাবে কিছু করে, তবে অন্য সকলের জন্যও সে বড় কিছু করতে পারে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ক্ষত পটি মালিশ ড্রিবলিং বঞ্চি কোলাহলকল মহাকলরব

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বঞ্চি পটি মালিশের ক্ষত মহাকলরব

ক. ইমদাদ হকের শরীরে অনেক আঘাতের রয়েছে।

খ. সন্ধ্যাবেলায় পায়ে হাতে বাঁধে সে।

গ. খেলায় জিতে দর্শকেরা করে ফিরে যাচ্ছে।

ঘ. টেবিলের ওপর শিশিগুলো রাখা আছে।

ঙ. পড়ার শব্দে শিশুটির ঘুম ভেঙ্গে গেল।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই ও শিখি।

ক. প্রভাত বেলায় ফুটবল খেলোয়াড় ইমদাদ হকের বিছানা শুন্য পড়ে আছে কেন?

খ. টেবিলের ওপরে ছেট-বড় মালিশের শিশি কবিকে উপহাস করছে কেন?

গ. কবিতায় ইমদাদ হকের খেলা ও দর্শকের আনন্দপূর্ণ নানান অভিমতের বর্ণনা দাও।

৫. খালি জায়গায় কবিতার ঠিক সাইনটি লিখি।

ক.,

সারা রাত শুধু ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ে।

খ. টেবিলের পরে ছোট বড় যত মালিশের শিশিগুলি,

.....।

গ. গোল—গোল—গোল— মোদের মেসের ইমদাদ হক কাজি,

.....।

৬. ইমদাদ হক সম্পর্কে পাচটি বাক্য লিখি।

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৮. কর্ম—অনুশীলন।

ক. আমার প্রিয় খেলা নিয়ে একটি রচনা লিখি।

খ. ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার সাময়িক ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটা
আবেদনপত্র লিখি।

গ. নিচের ফরমটি খাতায়/কাগজে লিখে পূরণ করি।

আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতা ফরম

১. শিক্ষার্থীর নাম :

২. বিদ্যালয়ের নাম :

৩. শ্রেণি :

৪. (ক) শিক্ষার্থীর পিতার নাম:

(খ) শিক্ষার্থীর মাতার নাম:

৫. বর্তমান ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নং ডাকঘর/মহল্লা

উপজেলা জেলা

৬. স্থায়ী ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নং ডাকঘর/মহল্লা
উপজেলা জেলা

৭. জন্ম তারিখ

৮. যেসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক

ক.

খ.

গ.

শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর



জ্যোতির্ময় উদ্দীন

কবি-পরিচিতি

কবি জ্যোতির্ময় উদ্দীন ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মতারিখ ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি।

গ্রামবাসীর প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতায় পল্লিজীবন বেশি উঠে এসেছে বলে তিনি ‘পল্লিকবি’ নামে খ্যাত হয়েছেন। তবে জ্যোতির্ময় উদ্দীন ছোটদের জন্যও অনেক সুন্দর কবিতা ও গদ্য রচনা করেছেন। তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনি ও আত্মজীবনী অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর কবিতা ‘কবর’, কাব্যগ্রন্থ ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ ও ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’, ছোটদের জন্য লেখা ‘ডালিম কুমার’, ‘হাসু’ ও ‘এক পয়সার বাঁশি’ বিখ্যাত। তিনি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

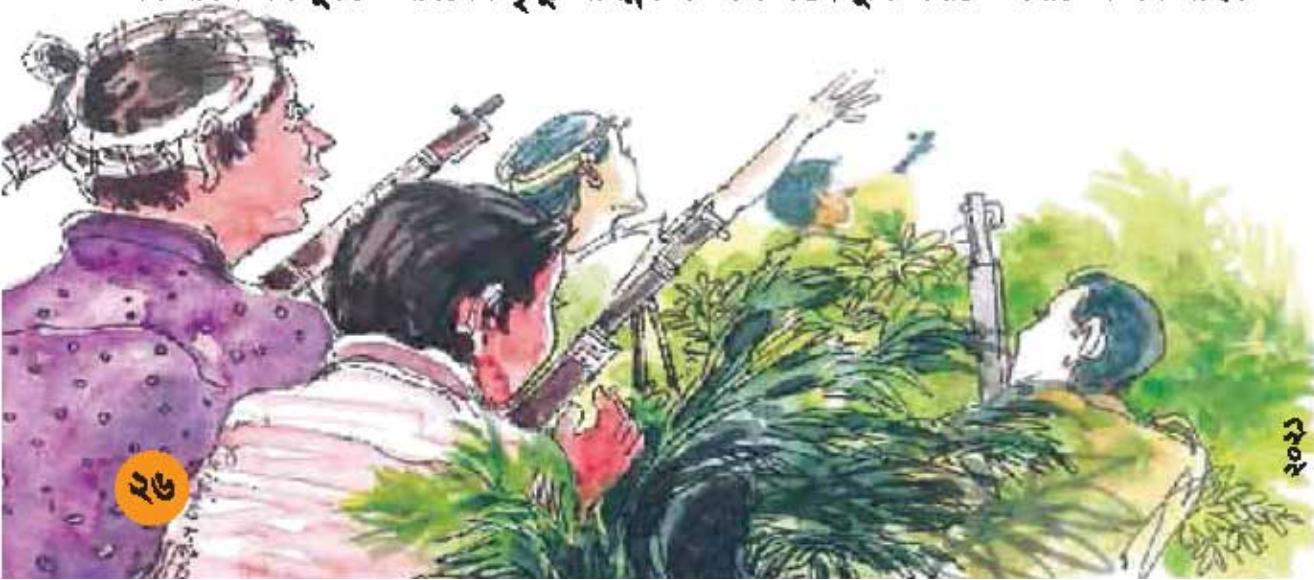
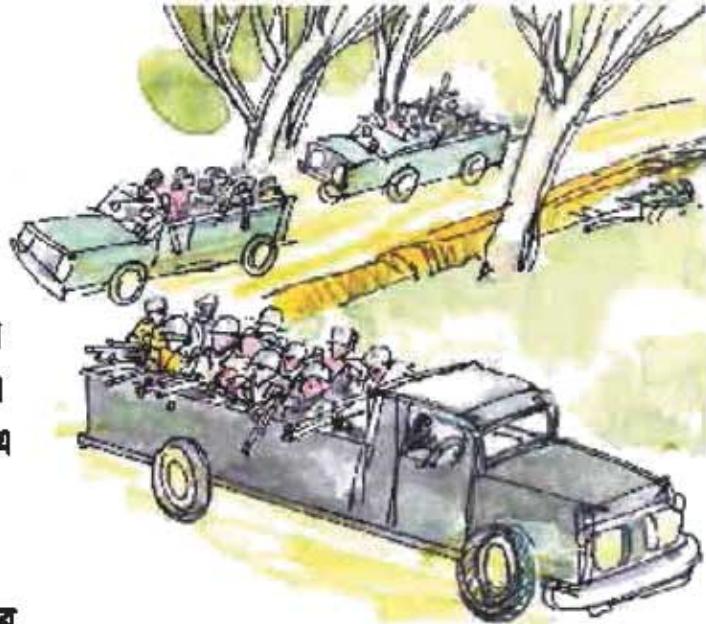
বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ

দূরত্ব এক কিলোমি। নাম নূর মোহাম্মদ শেখ।
বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। নাটক, থিয়েটার
আর গানের প্রতি তাঁর প্রিয় অনুরাগ। কিলোমি
বয়সে হঠাতে করে তাঁর বাবা-মা মারা গেলেন।
বদলে পেল তাঁর জীবন। যোগ দিলেন ইপিআর-এ
অর্ধাত ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ।

সময়টা ১৯৭১ সালের হৈ সেপ্টেম্বর।

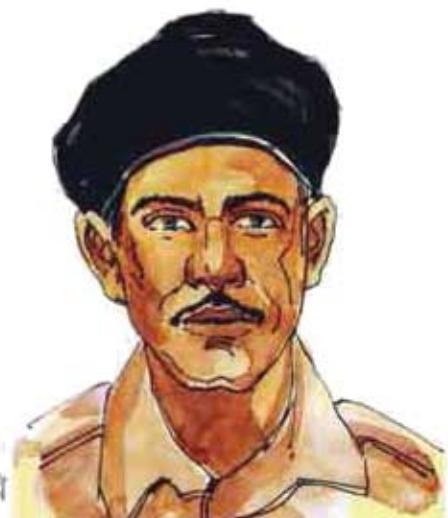
বশোরের পাকিস্তানি ছাউচিপুর ক্যাম্প। একটু দূরে
গোমালহাট গ্রামে টুল দিচ্ছিলেন শীচ মুক্তিযোদ্ধা। এন্দেরই নেতৃত্বে
ছিলেন শ্যামলনাথের নূর মোহাম্মদ শেখ। পাকিস্তানি সেনারা টের পেরে ঘায় মুক্তিযোদ্ধাদের
অবস্থান। রাজাকারদের সহারভায় তিনি দিক থেকে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের বিরে ফেলে।
কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা দমবার পাত্র নন। এই দলেই ছিলেন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নানু মিয়া।
কিন্তু প্রতিপক্ষের একটা গুলি হঠাতে এসে শাপে তাঁর গাঁথে। নূর মোহাম্মদ তাঁকে এক হাত দিয়ে
কাঁধে তুলে নিলেন আর অন্য হাত দিয়ে গুলি চালাতে থাকলেন। কৌশল হিসেবে বারবার নিজের
অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকলেন তিনি। উদ্দেশ্য-একজন নন, অনেক মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যু
করছেন, শহুরদের এ রকম একটা ধারণা দেওয়া। সংখ্যায় কম বলে সহবোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন
পিছিয়ে গিয়ে অবস্থান নিতে।

কিন্তু হঠাতে মর্টারের একটা গোলা এসে লাগল তাঁর পায়ে। গোলার আঘাতে চূর্ণ-কুর্ণ হৱে পেল
তাঁর পা। তিনি ঝুঁকতে পারলেন মৃত্যু আসল। বক্ষপথ সত্ত্বে গুলি চালাতে চালাতে তিনি শহিদ



হলেন। নিজের জীবনকে ভূজ করে নূর মোহাম্মদ শেখ
এতাবেই রক্ষা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন।
সাহসী এই বীরপ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার জন্ম ১৯৩৬ সালের
২৬শে কেন্দ্রোরি নড়াইলের মহিবখোলা থানে।

এ রকমই আরেক যোদ্ধা বীরপ্রেষ্ঠ শ্যামলায়েক মুলী আবদুর
রউফ। ১৯৪৩ সালের ৮ই মে ফরিদগুর জেলার বোয়ালমারী
থানার সালামতপুর থানে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায়
দারুণ দুর্ঘট হিলেন। তিনিও ইপিআর বাহিনীতে যোগ
দেন। মেশিন-চালক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।
মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাণিজি
সৈনিকদের মতো মুক্তিযুদ্ধে যৌগিকে পড়েন।



বীরপ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ

দিনটি ছিল একাত্তরের ৮ই এপ্রিল। ঐদিন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি নৌসেনাদের উপর আক্রমণ
করবে। এজন্যে তাঁরা যাহাশহড়ির কাছে বুড়িঘাট এলাকার চিহ্নি খালের দুই পাশে অবস্থান প্রস্তুত
করেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। সাথে নিয়ে আসে
সাতটি শিডবোট আর দুটি মোটর লাঙ। অসমস্থাক মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু ছিল অবধারিত। তবু

মুক্তিযোদ্ধারা পাশিয়ে যান নি। আবদুর রউফ নিজেই
দায়িত্ব নিলেন নিজের জীবন দিয়ে সবাইকে রক্ষা
করার। হালকা একটা মেশিনগান হাতে তুলে নিয়ে
গুলি ছুঁড়ে শহুদের ঝুঁকে দিতে থাকলেন। সহযোদ্ধাদের
বলগেন নিরাপদে সরে যেতে। মুক্তিযোদ্ধাদের
আক্রমণে পাকিস্তানিদের সাতটি শিডবোটই ছুবে
গেল। বাকি লঙ্ঘ দুটো থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাঁর
পিছু হটতে থাকল। এ রকম মৃত্যুভোগ হঠাৎ একটা গোলা
এসে পড়ল তাঁর উপর, তিনি শহিদ হলেন। বীরের
রক্তস্তোত্রে রঞ্জিত হলো মাটি। রাঙামাটি জেলার বোর্ড
বাজারের কাছে নানিয়ারচরের চিহ্নি খালের কাছাকাছি
একটি টিলার উপর সমাহিত হল বীরপ্রেষ্ঠ মুলী আবদুর
রউফ। গরবক্তী সময়ে সমাধিকে অতিক্রমে মৃগান্তরিত
করে সরবার।



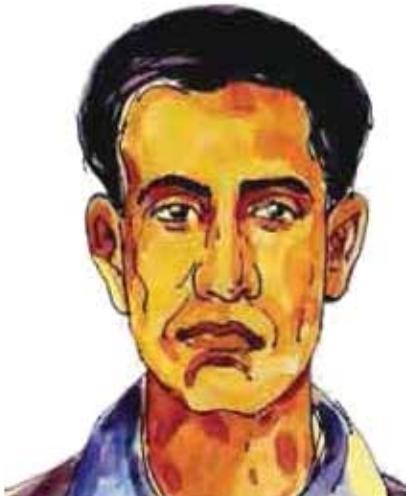
বীরপ্রেষ্ঠ মুলী আবদুর রউফ

একজনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কঢ়াবেই না যুদ্ধ
করতে হয়েছিল আমাদের। এই যুদ্ধে জয়ী বাহিনী হিসেবে
মুক্তিযোদ্ধারা বরে এলেছেন অসীম পৌরণ। এ রকমই এক
যুদ্ধে শহিদ হন বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ ঝুঁতুল আমিন।

ডিসেম্বরের ১০ তারিখ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রাতে আমরা।
মুক্তিযোদ্ধাদের নৌজাহাজ বিএনএস পলাশ এবং বিএনএস
পদ্মা মহা বন্দর দখল করে নিয়েছে। এবার খুলনা দখলই
সক্ষ্য। তৈরব নদী বেয়ে খুলনার দিকে থেমে আসছেন
তাঁরা।

জাহাজ দুটি খুলনার কাছাকাছি চলে আসে। এমন সময়
একটা বোমারু বিমান থেকে জাহাজ দুটির উপর বোমা এসে
পড়ে। ঝুঁতুল আমিন বিএনএস পলাশের ইঞ্জিনরুমে ছিলেন। ইঞ্জিনরুমের উপরে বোমা পড়েছিল।
ইঞ্জিন বিকল হয়ে আগুন ধরে পিয়েছিল পলাশে। তাঁর ডান হাতটি উচ্চে পিয়েছিল। তিনি আহত
অবস্থায় কাগ দিয়ে নদী সৌতরে পাড়ে উঠলেন। বোমার আঘাত থেকে তিনি রক্ষা পেলেন। কিন্তু
নাজাকতদের হাতে নির্মতাবে মৃত্যু হলো তাঁর। তিনি শহিদ হলেন। খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই
চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। এখানে একটি সৃতিশুল্ক নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আজ মুক্ত। শক্ত প্রাপ্তের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন
করি। দেশের এ বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের অন্য পরিত্যক্ত আমরা।



বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ ঝুঁতুল আমিন

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

টহল আসন্ন অবধারিত রক্তস্তোত্রে রাখিত শায়িত

২. ঘরের তিতকার শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

নূর মোহাম্মদ শেখ

নামু মিয়া

শিপইয়ার্ডের

১৯৪৩ ৮ই মে

ঝুঁতুল আমিন

ক. খ্যালনারেক নূর মোহাম্মদ শেখের দলে ছিলেন অসীম সাহসী

মুক্তিযোদ্ধা।

- খ. নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে সেদিন এভাবেই রক্ষা
করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন।
- গ. ল্যাঙ্গনায়েক মুসী আবদুর রউফ সালের মে ফরিদপুর
জেলার বোয়ালমারি থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ঘ. খুলনা কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বীরশ্রেষ্ঠ
..... |

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. নূর মোহাম্মদ শেখ কীভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচিয়ে
ছিলেন ?
- খ. ল্যাঙ্গনায়েক মুসী আবদুর রউফের যুদ্ধের ঘটনাটা লিখি।
- গ. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কীভাবে শহিদ হয়েছিলেন ?
- ঘ. গল্ল থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় বীরযোদ্ধাদের সমর্কে যা জেনেছি তা নিজের ভাষায় লিখি।

৪. ব্যাখ্যা করি।

দেশের এ বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গর্বিত আমরা।

৫. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

দুরঙ্গ	শান্ত	শান্ত ছেলেটি শুধু পড়তে ভালোবাসে।
অসীম
সুনাম
বীর
জয়
জীবন

৬. ঠিক উত্তরটিকে ঠিক (✓) টিক দিই।

ক. বাবা মারা যাওয়ার পর নূর মোহাম্মদ কিসে ঘোষ দিলেন?

১. বাংলাদেশ রাইফেলসে ২. ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে
৩. বাংলাদেশ নেতৃত্বে ৪. কোনোটিই না

খ. বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মদ শেখ এর জন্ম-

১. ১৯৩৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২. ১৯৩৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি
৩. ১৯৩৫ সালের ২৬শে জানুয়ারি ৪. ১৯৩৭ সালের ২৬শে আগস্ট

গ. মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানিদের কয়টি শিপড়বোট ভুবে লিয়েছিল?

১. পাঁচটি ২. আটটি
৩. সাতটি ৪. নয়টি

ঘ. বীরশ্রেষ্ঠ মুলী আবদুর রউফকে সমাহিত করা হয়-

১. বোয়ালমারিয়ির সামাজিকপুর ২. বঙ্গিবাজার
৩. নানিয়ারচন্দ্রের চিংড়িখাল ৪. বৃক্ষিষ্ট

ঙ. খুলনা শিপইঞ্চার্ডের কাছেই চিরন্তনাম শামিত আহেন বীর মুক্তিযোদ্ধা-

১. নূর মোহাম্মদ শেখ ২. মুলী আবদুর রউফ
৩. মোস্তফা কামাল ৪. মোহাম্মদ বুগুল আমিন

৭. অসমদের জাতীয় দিবসগুলোর পাশে ভারিখবাচক শব্দ লিখি।

ক. শহিদ দিবস-

খ. স্বাধীনতা দিবস-

গ. বাংলা নববর্ষ-

ঘ. শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস-

ঙ. বিজয় দিবস-





কেতুয়ারির গান

সুন্দর রহমান রিটন

দোঁয়েল কোঁয়েল ময়লা কোকিল
সবাই আছে গান
পাখির পানে পাখির সুরে
মুখ্য সবাই থাণ।

সাগর নদীর উর্মিমালার
মন ভোলানো সুর
নদী হচ্ছে শ্রোতৃবিনী
সাগর সমুদ্র।

ছড়ায় পাহাড় সুরের বাহার
বারনা-প্রকৃতিতে
বাতাসে তার প্রতিধ্বনি
শ্রীম-বর্ধা-শীতে।



গাহের গানে মুখ্য পাতা
মুখ্য অর্পণতা
হল-সুরে ফুলের সাথে
প্রজাপতির কথা।

ফুল পাখি নই, নইকো পাহাড়
বারনা সাগর নই
মায়ের মুখের মধুর ভাষায়
মনের কথা কই।

বাল্লা আমার মায়ের ভাষা
শহিদ ছেলের দান
আমার ভাইয়ের রক্তে লেখা
কেতুয়ারির গান।

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

১৯৫২ সালের একশে কেতুয়ারি বাঞ্ছলি জাতির জীবনে একটি অরণ্যীয় দিন। মাতৃভাষা বাঞ্ছাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্রসমাজ এই দিনে আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রদের মিহিসে পাকিস্তানি সরকার গুলি চালায়। সালাম, বরকত, শফিক, জবাব ও আরও অনেকে (বাদের নাম জানা যায় নি) শহিদ হন। এই ঘটনা অবলম্বন করে কবি লুৎফুর ইহমান রিটল ‘কেতুয়ারির গান’ কবিতাটি লিখেছেন। বাঞ্ছা ভাষার প্রতি ময়তা আয় শহিদদের প্রতি শপথ প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে শুনে কের করি। অর্থ বলি।

মুখ উরি উর্মিমালা স্নোভিনী সমুদ্রের বাহার ঝর্ণাতা প্রতিষ্ঠনি

৩. ঘড়ের ডিতের শব্দগুলো খালি আরণার বসিরে বাক্য তৈরি করি।

সমুদ্র	মুখ	বাহার	প্রতিষ্ঠনি	মন তোলানো	স্নোভিনীতে
--------	-----	-------	------------	-----------	------------

ক. বাঞ্ছার সৌন্দর্য দেখে আমি।

খ. শ্রীমতালে ফলের দেখা যায়।

গ. সাত তের বন্দী পায় হওয়া চাঢ়িখানি ব্যাপার না।

ঘ. তেসে চলেছে পাল তোলা মৌকা।

ঙ. রংখনুর রং এ আকাশ রঞ্জিল হয়েছে।

চ. সকল মানুষের কষ্টে একই।

৪. শব্দগুলোর উত্তর জেনে নিই ও নিবি।

ক. কবি এই কবিতায় কত ধরনের সুরের কথা বলেছেন?

খ. পাতা আয় ঝর্ণাতা কিসে মুখ হচ্ছে?

গ. প্রজাপতি ফুলের সাথে কীভাবে কথা বলে?

ঘ. আমরা কোন ভাষাতে আমাদের মনের কথা বলি?

ঙ. ‘শহিদ ছেলের দান’ হিসেবে আমরা কী পেয়েছি?



৫. ঠিক উত্তরটিতে ঠিক (✓) টিক দিই।

ক. মনের কথা কীভাবে বলব?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ১. মাঝের ভাষায় | ২. বাবার ভাষায় |
| ৩. দাদার ভাষায় | ৪. মামার ভাষায় |

খ. পাখির গানে সবার প্রাণ কেমন হয়?

- | | |
|-----------|----------|
| ১. বিলক্ষ | ২. মৃত্য |
| ৩. রাগ | ৪. খুশি |

গ. নদীর অপর নাম কী?

- | | |
|----------------|----------|
| ১. প্রাতসিন্ধী | ২. পুরূর |
| ৩. সমুদ্র | ৪. খাল |

ঘ. ফুলের সাথে কে কথা বলে?

- | | |
|-------------|---------|
| ১. অঙ্গাগতি | ২. হরিণ |
| ৩. মানুষ | ৪. পাখি |

ঙ. কেন্দ্ৰীয়াৱিৰ গান কাদেৱ রক্তে লেখা?

- | | |
|------------|------------|
| ১. ভাইয়েৱ | ২. মামার |
| ৩. বাবার | ৪. মানুষেৱ |



৬. কৰ্ত্ত-অনুশীলন

একুশে কেন্দ্ৰীয়াৱি সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা কৰি।



কৰ্ত্ত-অনুশীলন

মিৰ্টল

কৰ্ত্ত-পৱিত্ৰিতা

শুভকৰ ব্ৰহ্মান মিৰ্টল ১৯৬১ সালেৱ ১লা এপ্ৰিল ঢাকাব জন্মহণ
কৱেল। বিচিত্ৰ বিষয়ে ছড়া ও কবিতা রচনা কৱে ভূগুণ বয়সেই
তিনি পাঠকেৱ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৱেছেন। ছড়া ছড়াও তিনি গু
উপন্যাস লেখেন। এৱাই শীকৃতিমূল্প ২০০৭ সালে বাল্লা একাডেমি
সাহিত্য পুৰস্কাৰ গান। টেলিভিশনেৱ উপস্থাপক হিসেবেও তিনি
খ্যাতিমান। তাৰ উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ প্ৰস্থ : ‘শুভ্ৰি’, ‘ঢাকা
আমাৰ ঢাকা’, ‘ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ’, ‘ভূতেৱ বিৱেৱ নিয়জন্মে’,
‘বাকা হাতিৰ কান্দকাৰখানা’ ইত্যাদি।

শখের মৃৎশিল্প

গ্রামের নাম আনন্দপুর। মামার বাড়ি। কথায় আছে, মামার বাড়ি রসের ইঁড়ি। আসলেই তাই। পড়া নেই, বাধা নেই, বেধানে খুশি ঘূরে বেড়াও, যা খুশি খাও। এই তো মামার বাড়ি। গেল বছর পহেলা বৈশাখের ছুটিতে গিরেছিলাম আনন্দপুর। সেখানে পহেলা বৈশাখে মেলা বসে। মামা বললেন, তোমাদের মেলা দেখতে নিয়ে যাব।



শখের ইঁড়ি

আমরা ছিলাম চারজন—আমি, মামাতো বোন বৃক্ষি, সোহানা আর হেট তাই তাজিন। মেলা বসে সকালে। আমরা একটু দেরি করেই সেলাম। মামা বেশ মজার মানুষ। কাঁথে ঝোলানো একটা ব্যাগ। তাতে থাকে ছবি আৰাব জিনিস, থাকে একটা বাঁশি। পড়েন চাকার চারুকলা ইনসিটিউটে। মেলার একটু কাছে শৌচভেই শুলতে পেলাম নাগরদোলার ক্যাচর ক্যাচর শব্দ। দেখলাম বাঁশের তৈরি কূলো, ডালা, খুড়ি, চালুন, মাছ ধরার টাই, থাসুই। আরও কত কী! বসেছে বাণি, তরমুজ, মুড়ি-মুড়িকি, জিলাপি আৱ বাতাসাৱ দোকান সারি সারি। আঞ্জেকটু এগোতেই দেখতে পেলাম কল গজের, কল বর্ণের বিচ্ছি সব মাটির ইঁড়ি। ফুল, পাতা, মাছের ছবি আৰা সেসবে। গুৱেহে মাটিৱ ঘোড়া, হাতি, বাঁকু আৱ নানা আৰারেৱ মাটিৱ পুতুল। আমার ঢোক পড়ল কাজ কৱা অপূৰ্ব সুন্দৰ মাটিৱ ইঁড়িৱ দিকে। মামাকে জিজেস কৱলাম—এটা কিসেৱ ইঁড়ি?

মামা বললেন, এটা শখের হাড়ি। শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর হাড়িতে রাখা হয়। তাই এর নাম শখের হাড়ি। তাছাড়া শখের যেকোনো জিনিসই তো সুন্দর।

আমরা দুটি শখের হাড়ি কিনলাম। অবাক হলাম, পুতুলের পাশেই ঘোশা চোখে ঢেয়ে আছে এক চকচকে রূপালি ইলিশ। গল্পার তাজা ইলিশের মতোই। তেমনি সাদা ওঁশ, লাল ঠোট। আমরা একটা মাটির ইলিশও কিনলাম। মামা বললেন, এই যে পুতুলগুলো দেখছ ওগুলো টেপা পুতুল। নরম এঁটেল মাটি টিপে টিপে এসব পুতুল বানানো হয়। যেমন— বউ জামাই, কৃষক, নথপরা ছেট মেয়ে—লালা রকমের মাটির টেপা পুতুল। মেলার এক প্রান্তে বড় জাহাঙ্গী জুড়ে এসব মাটির পুতুলের দোকান। মামা বললেন, এগুলো হচ্ছে মাটির শিল্পকলা। মামা বুঝিয়ে বললেন— যখন কোনো কিছু সুন্দর করে আকি বা বানাই অথবা গাই, তখন তা হয় শিল্প। শিল্পের এ কাজকে বলে শিল্পকলা। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প। এ দেশের কুমার সম্মানযুগ যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছে মাটির জিনিস।

যেমন— কলস, হাড়ি, সরো, বাসনকোসন, শেঁয়ালা, সুয়াই, ঘটকা, জালা, পিঠে তৈরির নানা হাঁচ। আরও কৃত কী।

মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। তবে সব মাটি দিয়ে এ কাজ হয় না। দরকার পরিষ্কার এঁটেল মাটি। এ ধরনের মাটি বেশ আঠালো। দেখাশ মাটি তেমন আঠালো নয়। আর বেলে মাটি তো বারবারে— তাই এগুলো দিয়ে মাটির শিল্প হয় না। এঁটেল মাটি হলেই যে তা দিয়ে শিল্পের কাজ করা যাবে তাও নয়। এজন্য অনেক বন্ধু আর শ্রম দরকার। দরকার হাতের নৈপুণ্য ও কানিশরি জ্ঞান। কুমারদের কাছে এসব খুব সহজ। কানিশ তারা বলে পরিষ্কার এ কাজ করে আসছে।



টেপা পুতুল



টেপা পুতুল



কাঠের চাকার মাটির পাত্র তৈরি যাচ্ছে

আবার এ কাজের জন্য প্রয়োজন কিছু ছেটখাটো বন্ধপাতি ও সরঞ্জাম। সবকিছুর আগে ঘেঁটা দরকার তা হলো একটা কাঠের চাকা। এই চাকায় নরম মাটির তাল শাপিয়ে নেল কূমাররা। তাঙ্গপর চাকাটি জোতে ঘোরান। আবু হাত দিয়ে মাটির তাল ধরেন। এভাবে নানা আকারের মাটির পাত্র ও নানা জিনিস তৈরি করেন কূমাররা।

মেলা থেকে সেদিন আমরা অনেক টেপা পুতুল, ঘোড়া, হাতি, ছেট কলস কিনলাম। যামা বললেন, এত সুন্দর নকশা দেখছ, রং দেখছ- এ সবই প্রায়ের শিক্ষাদের তৈরি। নকশাগুলো তাঁরা মন থেকে আঁকেন। আর রং তৈরি করেন শিম, সেগুন পাতার রস, কাঁঠাল পাতের বাকল থেকে। তবে আজকাল বাজার থেকে কেলা রংও লাগানো হয়। মেলা থেকে কদম্বা, বাভাসা, মুড়কি ও ধৈ কিনে শখের ইঁড়ি ভর্তি করে আমরা ফিরলাম। খুব মজা হলো।

যামা বললেন, তোমাদের কাল কূমারপাড়ায় নিয়ে যাব। প্রয়োজন আমরা দেখতে পেলাম কূমারপাড়া। আনন্দপুর প্রায়ের উত্তর দিকে আট-দশ ঘর বসতবাড়ি। এই নিয়ে কূমারপাড়া। এখানে সবাই ব্যস্ত। কেউ মাটির তাল চাক করে সাজিয়ে রাখছেন। কেউ-বা কাঠের চাকায় মাটি শাপিয়ে নানা আকারের পাত্র বানাচ্ছেন। কেউ-বা এগুলো সারি সারি করে শুকোতে দিছেন ঝোদে। পাশেই রয়েছে মাটির জিনিস পোড়ানোর চূলা। জেনু ছেট চিবির ঘরে এই চূলা। মাটির পোড়া গল্প

পাছি। আর ধোঁয়া বেরোছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এ কাজ করছে। মামা বললেন, হাঁড়ি
কলসি ছাড়াও আমাদের দেশে এক সময় সুন্দর পোড়ামাটির ফলকের কাজ হতো। এর অন্য
নাম টেরাকোটা। বাংলার অনেক পুরানো শিল্প এই টেরাকোটা। নকশা করা মাটির ফলক ইটের
মতো পুড়িয়ে তৈরি করা হতো এই টেরাকোটা। শালবন বিহার, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর বৌদ্ধ
বিহার ও দিনাজপুরের কাঞ্চজির মন্দিরে এই টেরাকোটার কাজ রয়েছে। মাটির ফলকে ছবি একে
শুকিয়ে পোড়ানোর পর এগুলো এমন সুন্দর হয়ে ওঠে! ছোট ছোট ফলককে পাশাপাশি জোড়া
দিয়ে বড় করা যায়। পোড়ামাটির এই ফলক বাংলার প্রাচীন মৃৎশিল্প। মামা বললেন, টেরাকোটা
বা পোড়ামাটির এসব কাজ এ দেশে শুরু হয়েছে হাজার বছর আগে।

আজকাল কি পোড়ামাটির এই শিল্পচর্চা হয় না? মামার কাছে জানতে চাইলাম আমরা। মামা
বললেন, আজকাল ওরকম টেরাকোটা হচ্ছে না বটে, তবে পোড়ামাটির নকশার কদর বেড়েছে।
সরকারি-বেসরকারি ভবনে আজকাল সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য নানা রকম নকশা করা মাটির
ফলক ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের দেশের কুমাররা এসব তৈরি করছেন। বললাম, আমরা এসব
পোড়ামাটির কাজ দেখতে চাই।

মামা বললেন, সুযোগমতো এক সময় তোমাদের শালবন বিহারে নিয়ে যাব।

-সংগৃহীত

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

শখ টেপা পুতুল নকশা শালবন বিহার টেরাকোটা মৃৎশিল্প শখের হাঁড়ি

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

শখ নকশা মৃৎশিল্প টেপা পুতুল

ক. এই যে দেখছ, এসবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরি।

খ. মাটির পুতুল জমানো আমার একটি।

গ. মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে বলে।

ঘ. আমরা মেলা থেকে অনেক কিনলাম।

৩. ঠিক উভয়টিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. আনন্দপুরে কখন মেলা বসে?

- | | |
|----------------------|------------------|
| ১. ঘোলই ডিসেম্বর | ২. পহেলা বৈশাখ |
| ৩. একুশে ফেব্রুয়ারি | ৪. পহেলা ফাল্গুন |

খ. মামা কোথায় পড়েন?

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ১. ঢাকা কলেজে | ২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে |
| ৩. ঢাকার চারুকলা ইনসিটিউটে | ৪. চট্টগ্রামের চারুকলা ইনসিটিউটে |

গ. মৃৎশিল্পের সবচেয়ে প্রাচীন উপাদান হচ্ছে -

- | | |
|---------|---------|
| ১. বাঁশ | ২. কাঠ |
| ৩. পানি | ৪. মাটি |

ঘ. আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে -

- | | |
|--------------|--------------|
| ১. চারুশিল্প | ২. মৃৎশিল্প |
| ২. কারুশিল্প | ৪. দারুশিল্প |

ঙ. কুমার সম্মদায় কিসের কাজ করে-

- | | |
|--------------------|--------------|
| ১. বাঁশের কাজ | ২. কাঠের কাজ |
| ৩. পাকা বাঢ়ির কাজ | ৪. মাটির কাজ |

চ. গ্রামের শিল্পীরা রং তৈরি করেন-

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| ১. আম ও লাউ পাতা থেকে | ২. শিম ও কাঁঠাল গাছের বাকল থেকে |
| ৩. সরিষা ফুল থেকে | ৪. পান ও চুন থেকে |

ছ. পোড়া মাটির ফলকের অন্য নাম-

- | | |
|---------------|-------------|
| ১. টেপা পুতুল | ২. টেরাকোটা |
| ৩. শখের ইঁড়ি | ৪. মৃৎশিল্প |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. মাটির শিল্প বলতে কী বুঝি ?
 - খ. বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম কোনটি ?
 - গ. শখের ইঁড়ি কী রকম ?
 - ঘ. বৈশাখী মেলায় কী কী পাওয়া যায় ?
 - ঙ. মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান কী ?
 - চ. কয়েকটি মৃৎশিল্পের নাম বলি ।
 - ছ. টেরাকোটা কী ?
 - জ. বাংলাদেশের কোথায় পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প দেখতে পাওয়া যায় ?
 - ঝ. মাটির শিল্প কেন আমাদের ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয় ?
 - ঝঃ. মামার বাড়ি রসের ইঁড়ি-প্রচলিত এই কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয় ?

৫. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ি এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

যখন কোনো কিছু সুন্দর করে আঁকি বা বানাই অথবা গাই, তখন তা হয় শিল্প। শিল্পের এ কাজকে বলে শিল্পকলা। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প। এ দেশের কুমার সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছে মাটির জিনিস, যেমন- কলস, ইঁড়ি, সরা, বাসনকোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির নানা ছাঁচ। আরও কত কী! মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। মাটি হলেই যে তা দিয়ে শিল্পের কাজ করা যাবে তাও নয়। এজন্য অনেক যত্ন আর শ্রম দরকার। দরকার হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান। কুমারদের কাছে এসব খুব সহজ। কারণ তাঁরা বৎশ পরম্পরায় এ কাজ করে আসছেন।

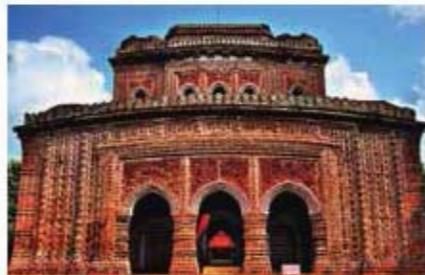
- ক. শিল্পকলা বলতে কী বোঝা ?
খ. শিল্পের কাজের জন্য কী কী প্রয়োজন ?
গ. কেন কুমারদের কাছে এসব কাজ সহজ ?

৬. নিচের শব্দগুলো দিয়ে যা বুঝি তা লিখি।

- ক. মৃঢ়শিঙ্গ
খ. শখের হাঁড়ি
গ. টেরাকোটা
ঘ. টেপা পুতুল

৭. নিচের কথাগুলো কুম্হে নিই।

কান্তজির মন্দির ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজা রামনাথ রাম দিলাজপুরের কান্তজির মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দিরের গায়ে স্থাপিত অগুর্ব সুন্দর চেরাকোটা বালার মাটির শিল্পের প্রাচীন নিদর্শন।



পাহাড়পুর

নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন সোমপুর বিহার। এই সোমপুর বিহারের আশ-পাশের বড় বৌদ্ধ মন্দিরে পাওয়া গেছে অনেক সুন্দর চেরাকোটা। এগুলো অষ্টম শতকের অর্ধাং আজ থেকে প্রায় বারো শ বছর আগের তৈরি।



শালবন বিহার

কুমিল্লার ময়লামতিতে মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। অষ্টম শতকের এই পুরাকীর্তি বালাদেশের প্রাচীন সভ্যতার পরিচারক। শালবন বিহারে পাওয়া গেছে নানা ধরনের পোড়ামাটির ফলক।



মহাস্থানগড়

কাশুড়া শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত মহাস্থানগড়। যিশু খ্রিস্টের অন্ত্যের পূর্বে তৃতীয় থেকে পরবর্তী পনেরো শতকে বালার এ প্রাচীন নগর গড়ে উঠে।



মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে অনেক পোড়ামাটির ফলক, পাত্র, অলংকার ও মূর্তি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমার দেখা কুমারগাড়ীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিই।

অধ্যবা

আমার দেখা কোনো হস্তশিল্প বা হাতের কাছ সম্পর্কে লিখি।

শহদূষণ

সুকুমার বজ্জ্বলা

গুৱু ডাকে হাস ডাকে—ডাকে কুন্তুর
গাছে ডাকে শত পাখি সারা দিনতর।
মোরগের ডাক শুনি প্রতিদিন ভোরে
নিশিয়াতে কুকুরের দল ডাকে জ্বোরে।
দোয়েল চড়ুই ঘিলে কিটির মিটির
শান শুনি শুশু আৱ টুন্টুনিতির।



শহরের পাতি কাক ডাকে বৌকে বৌকে
যুম দেয়া মূলকিল হর্নের হাকে।
সিডি চলে, টিডি চলে, বাজে টেলিফোন
দৱজায় বেল বাজে, কান পেতে শোন।
গলিগথে ফেরিঅলা হাকে আৱ হাটে
ছেটদের হইচই ইলকুল মাঠে।
পল্লির সেই সুরে ভৱে যায় মন
শহুত্তো জীবন দ্বালা—শহদূষণ।



ଅନୁଶୀଳନୀ

୧. ଶଦ୍ଗୁଲୋ ପାଠ ଥେକେ ଖୁଜେ ବେର କରି । ଅର୍ଥ ବଳି ।

ନିଶିରାତ କିଚିର ମିଚିର ଫେରିଅଳା ଶଦ୍ଦୂଷଣ

୨. ସରେର ଭିତରେର ଶଦ୍ଗୁଲୋ ଖାଲି ଜାଯଗାୟ ବସିଯେ ବାକ୍ୟ ତୈରି କରି ।

ଫେରିଅଳା ନିଶିରାତ ଶଦ୍ଦୂଷଣ କିଚିର ମିଚିର

କ. ଚେଂଚାମେଟି କରୋ ନା, ସବାଇ ସୁମୁଛେ ।

ଖ. ତୋର ବେଳାତେଇ ପାଖିର ଶୁନତେ ଶୁନତେ ଆମାର ସୁମ ଭାଙ୍ଗେ ।

ଗ. ହାଁକ ଦିଛେ-ଥାଲାବାସନ ଚାଇ ?

ଘ. ଆମାଦେର ଶୋନାର କ୍ଷମତା କମିଯେ ଦେଇ ।

୩. ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ତର ବଳି ଓ ଲିଖି ।

କ. କବିତାଯ କୋନ କୋନ ପଶୁ ଓ ପାଖିର କଥା ବଲା ହେଁଥେ ?

ଖ. ଶହରେ କୀ କାରଣେ ଶଦ୍ଦୂଷଣ ହେଁ ?

ଗ. କୁକୁରେର ଡାକ ଆର ପାଖିର ଡାକେର ମଧ୍ୟ କୋନଟି ତୋମାର ଭାଲୋ ଲାଗେ ? କେନ ?

ଘ. ଗ୍ରାମେର ମାନୁଷ କୋନ ପାଖିର ଡାକ ଶୁନେ ସୁମ ଥେକେ ଓଠେନ ?

୪. ଶତ୍ରୁରେ ଜୀବନେର ସାଥେ ଗ୍ରାମେର ଜୀବନେର ତୁଳନା କରି ଓ ଲିଖି ।

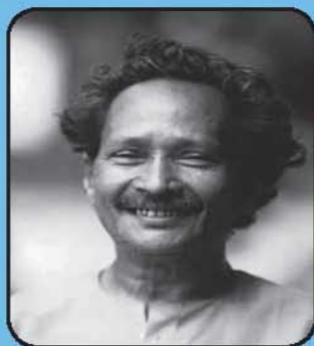
ବିଷୟବସ୍ତୁ	ଶତ୍ରୁରେ ଜୀବନ	ଗ୍ରାମେର ଜୀବନ
ପରିବେଶ		
ଶଦ		
ରାଷ୍ଟ୍ରାଧାର		
ଜୀବନ୍ୟାତ୍ରା		
ହାଟବାଜାର		

৫. কথাগুলো বুবো নিই।

পল্লির সেই সূরে ভরে যায় মন
শহুরে জীবন জ্বালা-শব্দদুর্বণ।

শহরে শান্তিতে বসবাস করা মুশকিল। কারণ হাজার
রকমের শব্দ কান ঝালাপালা করে দেয়। গ্রামে শব্দ
অনেক কম, তার ফলে মনের শান্তি বজায় থাকে।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।



কবি-পরিচিতি

সুকুমার বড়ুয়া বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ছড়াকার। তিনি ১৯৩৮ সালের ফেই জানুয়ারি চট্টগ্রামের রাউজান থানার বিনাজুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ : পাগলা ঘোড়া, ভিজে বেড়াল, চন্দনা রঞ্জনার ছড়া, এলোপাতাড়ি, নানা রঞ্জের দিন, চিতৎফাক প্রভৃতি। তিনি শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেছেন।

সুকুমার বড়ুয়া

ঘৰণীয় যাঁৱা চিৰদিন

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বৰ। আমাদেৱ জাতীয় জীবনেৱ একটি পূজ্যপূৰ্ণ দিন। এই দিন আমৱা দেশকে পুৱোপুৱি শক্তিমুক্ত কৰে বিজয় অৰ্জন কৱি। এই বিজয়কে পাওয়াৱ আগে দেশবাসীকে কৱতে হয় এক মৱণগণ মুক্তিযুৰ্ব। আমাদেৱ সাহসী বীৱ মুক্তিযোৰ্ধ্বাৱা যুদ্ধ কৱেছেন পাকিস্তানি শক্তিসেনাদেৱ বিৰুদ্ধে। দেশেৱ অন্য সব সাধাৱণ মানুষ তাঁদেৱ জুগিয়েছেন ভৱসা ও সাহস। অপেক্ষা কৱেছেন শক্তিৱ হাত ধোকে সম্পূৰ্ণ মুক্ত হওয়াৱ। সশৰ যুদ্ধে আমাদেৱ মুক্তিসেনারা প্ৰাণ দেন। আৱ দেশেৱ ভিতৰে অববুৰ্ধ জীবনযাপন কৱতে কৱতে প্ৰাণ দেন এদেশেৱ লক্ষ লক্ষ মানুৰ। তাঁৱা ছিলেন নানা পেশাৱ- কেউ ছাত্ৰ, কেউ কৃষক, কেউ মজুৱ, কেউ পুলিশ, কেউ সৈনিক। আৱও ছিলেন শিক্ষক, সাহাদিক, সংৰক্ষাৱি কৰ্মকৰ্তা ও নানা পেশাৱ লোক। লক্ষ লক্ষ নায়ী-পুৱুষ-শিশুৱ রক্তে তেজো আমাদেৱ স্বাধীনতা। তাঁদেৱ প্ৰাণেৱ বিনিয়য়ে আমৱা আৰু মুক্ত স্বাধীন দেশে উন্নত শিৱে জীবনযাপন কৱতে গাৱাছি। আমৱা কৃতজ্ঞ তাঁদেৱ কাছে। সেই অসংখ্য মহান আত্মানকাৰীদেৱ কৱেকজনেৱ কথা আমৱা জেনে নিব।

১৯৭১ সালেৱ পঁচিশে মাৰ্চ পাকিস্তানি সেনারা গভীৱ রাতে ঝাপিয়ে পড়ে ঢাকাৱ নিৱৰ্ষ, সুমন্ত মানুৱেৱ গুপ্ত। আক্ৰমণ চালাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েৱ ছাত্ৰাবাসে, ব্যারাকে, আৱ নানা আবাসিক এলাকায়। নিৰ্বিচারে হত্যা কৱে যুদ্ধ মানুৱকে। সেই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে বেতে থাকে বিৱামহীন। চালিয়ে বেতে থাকে পৱনকৰ্তা নৱ মাস ধৰে। পাশাপাশি তাৱা বিশেষ রকমেৱ হত্যাকাণ্ড চালানোৱা পৱিকজনাও কৱে। সেই পৱিকজনা অনুসানে একে একে হত্যা কৱে এদেশেৱ মেধাৰী, আলোকিত ও বৰেণ্য মানুৱদেৱ। পুৱো দেশেৱ নানা পেশাৱ মেধাৰী ব্যক্তিদেৱ ভালিকা তৈৱি কৱে তাৱা।



আবুলকালম আজদ



বেগুম রোকেয়া



হেমন্তকুমাৰ মুখোপাদ্য

হত্যা পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য পাকিস্তানিয়া গড়ে ভোলে রাজাকুর, আলবদর ও আল শামস বাহিনী। পাকিস্তানি কিছু লোকজন ঘোষ দেয় শহীদ সব বাহিনীতে। তারা পাকিস্তানি সেনাদের শহীদ হত্যা পরিকল্পনার সহযোগিতা করে।



মুজামিল আলি



গোলাম গণি



শাহিদুল হাসান

পেটিশন মার্চের যথ্যরাতে শহীদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোৱী শিক্ষক এম. মুনিরুজ্জামান, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহষ্ঠাকুরতা, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব। পাকিস্তানি সেনারা সেই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতেই শুধু আক্রমণ চালায় নি। হানা দেয় তারা শিক্ষকদের বাড়িতে বাড়িতেও। বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন এম. মুনিরুজ্জামান। প্রচণ্ড গোলামগুলির শব্দ শুনে তিনি পরিত্র কুরআন পড়া শুন্ন করেন। এই কুরআন পাঠ্রত মানুষটিকেই টেনে হিচড়ে নিচে নামায় পাকিস্তানি সেনায়। একই বাড়ির নিচতলায় থাকতেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহষ্ঠাকুরতা। ইংরেজি সাহিত্যের ধ্যাতিমান শিক্ষক। তাঁকেও শত্রুসেনারা টেনে হিচড়ে বের করে আনে। তারপর এই দুই শিক্ষককেই গুলি করে হত্যা করে। এ বাড়ির খুব কাছেই এক বাসায় থাকতেন অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব। দর্শনশাস্ত্র যশোৱী শিক্ষক ছিলেন তিনি। মানুষ হিসেবে ছিলেন খুব সহজ সরল আর নিরহকার। শহীদ একই রাতে তাঁকেও হত্যা করে তারা। হত্যা করে আরও করেকজন শিক্ষককে।

পেটিশন মার্চ রাতে আক্রান্ত হয় সংবাদপত্র অফিসগুলোও। প্রধান সংবাদপত্রগুলোর অনেক অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা সেই রাতে। হত্যা করে বহু সাংবাদিককে। পেটিশন মার্চের রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা দৈনিক ‘সংবাদ’ অফিসে আগুন দেয়। সেখক ও সাংবাদিক শহীদ সাবের সে রাতে ঐ অফিসেই ঘূর্মাছিলেন। ঘূর্মত অবস্থায় সংবাদ অফিসে পুড়ে মাঝা যান তিনি। শহীদ হন সেলিনা পারভীন। মাত্র পেটিশন বছর বয়সে থাণ দেন কবি-সাংবাদিক মেহেরুল্লেসা।

তারা হত্যা করে প্রথ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী ধীরেশ্বনাথ দত্তকে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিলেন। কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে শত্রুসেনারা তাঁকে হত্যা করে। অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, দেশবাসীর স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আয়ুর্বেদীয় একটি প্রতিষ্ঠান সাধনা উৎসধালয়। ৮৪ বছর বয়স্ক এই মানুষটিও রেহাই পান নি পাকিস্তানি শত্রুদের হাত থেকে। তাঁকেও হত্যা করে পাকিস্তানি সেনারা।

এ দেশের সাধারণ মানুষের মজাল ও কল্যাণের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন রণদাত্রসাদ সাহা। দানশীলতার জন্য লোকে তাঁকে ডাকত ‘দানবীর’ বলে। হত্যা করা হয় তাঁকে। চট্টগ্রামের বিখ্যাত সমাজসেবক ছিলেন নূতনচন্দ্র সিংহ। শত্রুসেনারা তাঁকেও রেহাই দেয় নি।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহিদদের শ্রবণ করে আমরা ফুল দিতে যাই শহিদ মিনারে। তখন আমাদের মনে আর মুখে বেজে ওঠে একটি গান- ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঞ্জনো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’। এ গানে সুর দেন আলতাফ মাহমুদ। প্রতিভাবান এই সুরসাথকের প্রাণ কেড়ে নেয় পাকিস্তানি বাহিনী।

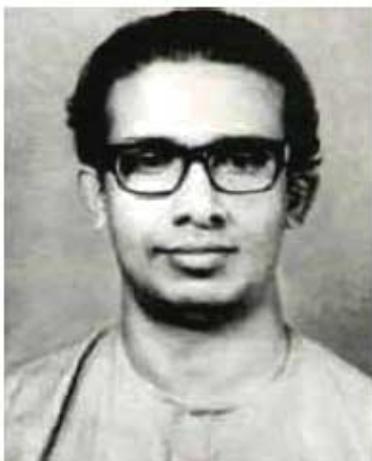
মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয় অবধারিত। তখন তারা এদেশকে আরও গভীরভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়। তারা জানে এদেশের মনস্বী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সৃষ্টিশীল মানুষদের হত্যা করলে এদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। পাকিস্তানিরা আমাদের সেই অপূরণীয় ক্ষতি করার কাজ শুরু করে। রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সহায়তায় নতুন করে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। বিভিন্ন আবাসস্থল থেকে তারা ধরে নিয়ে যায় দেশের শক্তিমান, যশস্বী ও প্রতিভাবানদের। তারা ধরে নিয়ে যায় অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও অধ্যাপক আনন্দায়ার পাশাকে। তাঁরা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তুলে নিয়ে যায় ইতিহাসের অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদকে। ইংরেজির অধ্যাপক রাশীদুল হাসানও বাদ পড়েন না।

শত্রুরা তুলে নিয়ে যায় প্রথ্যাত লেখক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে। সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, নিজাম উদ্দীন আহমদ ও আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা, প্রথ্যাত চিকিৎসক ফজলে রাবী, আবদুল আলীম চৌধুরী, মোহাম্মদ মোর্তজাকেও একইভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ধরে নিয়ে যাওয়া হয় আরও বহু জনকে। এঁরা কেউই আর জীবিত ফিরে আসেন নি।

দেশ স্বাধীন হবার পরে এ সকল বৃশিজীবীর অনেকের ক্ষত-বিক্ষত শাশ পাওয়া থাই মিরপুর ও
রায়ের বাজারের বখ্যাতিতে। আবার অনেকের কোনো সম্মানও পাওয়া থাই নি।



পর্যন্তুরা কাহার



আসোয়ার গো



কজল রামী

তাদের অরণে প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর আমরা পালন করি ‘শহিদ বৃশিজীবী দিবস’। এ জাতীয়
শ্রেষ্ঠ সজ্ঞান ছিলেন তারা। তাদের প্রাণদান আমরা কখনো ব্যর্থ হতে দেব না। আমরা তাদের
শরণ করব চিরদিন। দেশ ও মাতৃভাষার অন্য ভ্যাগের মহান আদর্শ তারা স্থাপন করে পেছেন।
আমরা সেই আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের যোগ্য মানুষ ঝূঁপে গড়ে তুলব। তবেই তাদের খণ
শোধ করা সম্ভব হবে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অবস্থা অবধারিত আত্মানকারী নির্বিচারে বরেণ্য পাষণ্ড মনুষী যশোৰী

২. অঙ্গের শিতকৌর শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অবস্থা	অবধারিত	আত্মানকারী	বরেণ্য	নির্বিচারে	যশোৰী	পাষণ্ড	মনুষী
--------	---------	------------	--------	------------	-------	--------	-------

ক. তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয়।

খ. দেশের শিতকৌর জীবন্যাপন করতে করতে প্রাপ দেন
এদেশের শক্ত শক্ত মানুষ।

গ. পাকিস্তানিরা একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও
মানুষদের।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে শহিদরা মহান হিসাবে চিরস্মরণীয়।

ঙ. পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে নিন্দিত মানুষকে।

চ. অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক।

ছ. কিছু লোকজন যোগ দেয় ওইসব বাহিনীতে।

জ. রাজাকার বাহিনী এদেশের অনেক চিন্তাবিদদের হত্যা করে।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে কী করেছিল?

খ. রাজাকার আলবদর কারা? তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলি ও লিখি।

গ. কোন শহিদ বুদ্ধিজীবী প্রথম পাকিস্তানি গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি
জানান? তাঁর সম্পর্কে বলি ও লিখি।

ঘ. শহিদ সাবের কে ছিলেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?

ঙ. রণদাপ্রসাদ সাহাকে কেন দানবীর বলা হয়?

চ. দুজন শহিদ সাংবাদিকের নাম বলি ও তাঁরা কোথায় কীভাবে শহিদ হন সে সম্পর্কে
লিখি।

ছ. আমরা কেন চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করব?

জ. কোন দিনটিকে ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়? কেন?

ঝ. আমরা কীভাবে শহিদদের খণ্ড শোধ করতে পারি?

৪. বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

বরণ করার যোগ্য

মেধাবী

মেধা আছে এমন যে জন

নিরহংকার

অহংকার নেই যার

বরেণ্য

বিচার-বিবেচনা ছাড়া যা

অপূরণীয়

কোনোভাবেই পূরণ করা যায় না এমন

নির্বিচার

৫. ঠিক উভরটিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. কোন তারিখে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়ে ?

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| ১. ১৯৭১ সালের সাতাশে মার্চ | ২. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ |
| ৩. ১৯৭১ সালের উনত্রিশে মার্চ | ৪. ১৯৭১ সালের ছাবিশে মার্চ |

খ. প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর পালন করা হয় -

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| ১. ‘স্বাধীনতা দিবস’ হিসেবে | ২. ‘মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে |
| ৩. ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ হিসেবে | ৪. ‘বিজয় দিবস’ হিসেবে |

গ. দেশ স্বাধীন হবার পর বুদ্ধিজীবীদের ক্ষত-বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় -

- | |
|---------------------------------------|
| ১. মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে |
| ২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে |
| ৩. ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে |
| ৪. সংবাদপত্র অফিসে |

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঘুমন্ত	জাগ্রত	স্বাধীন	পরাধীন	সাধু	অসাধু	লোভী	নির্লোভ	সরল	গরল
--------	--------	---------	--------	------	-------	------	---------	-----	-----

ক. অবস্থায় সংবাদ অফিসে শহিদ হন শহিদ সাবের।

খ. দেশ হবার পরে অনেক বুদ্ধিজীবীর লাশ পাওয়া যায়।

গ. এদেশের কৃষক জীবনযাপন করে।

ঘ. বাংলাদেশে অনেক সন্ন্যাসী বাস করে।

ঙ. আলবদর বাহিনীর লোকেরা ছিল অসাধু ও।

৭. ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী’ সম্পর্কে আমার অনুভূতি শিখি।

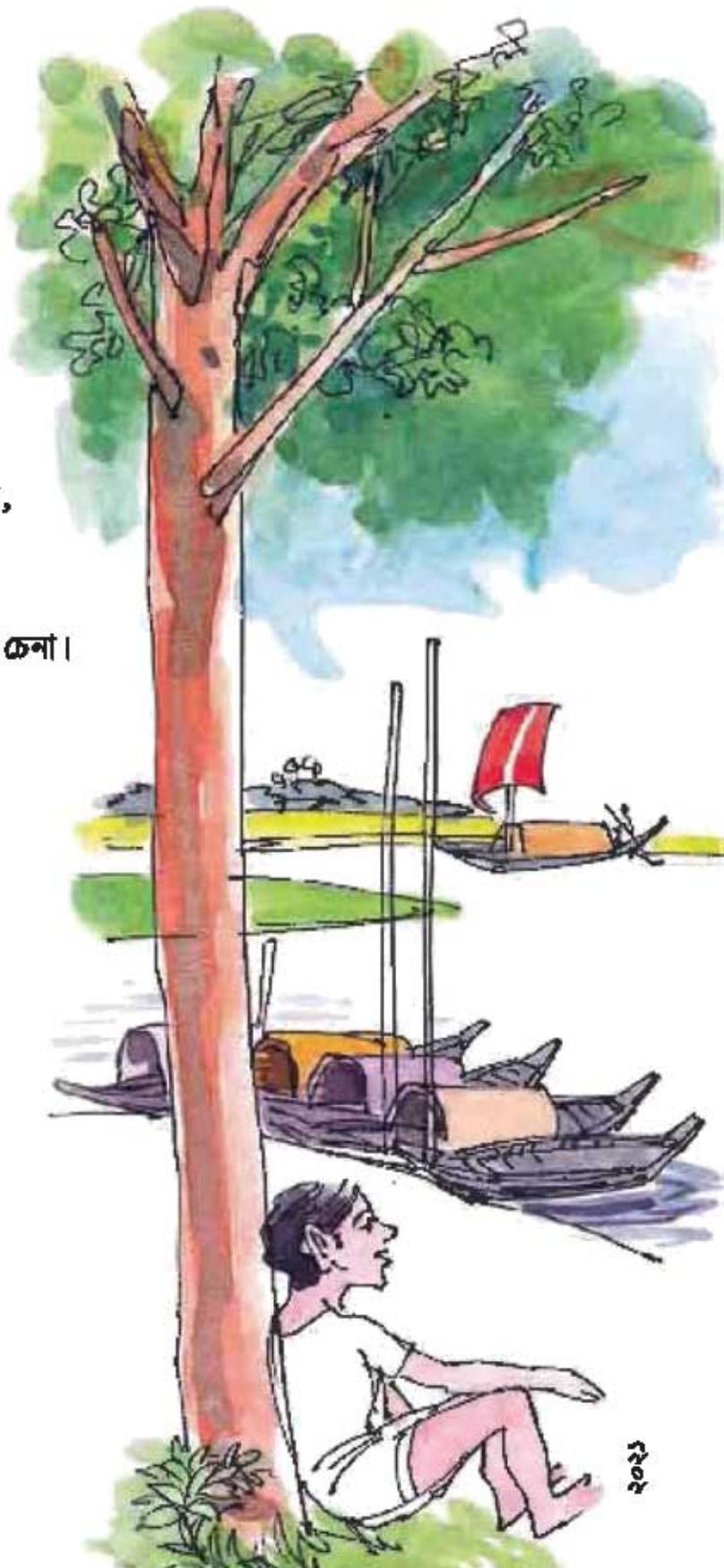
স্বদেশ

আহসান হারীব

এই যে নদী
 নদীর জোয়ার
 নৌকা সারে সারে,
 একলা বসে আপন মনে
 বসে নদীর ধারে—
 এই ছবিটি চেনা।

মনের মধ্যে যখন খুশি
 এই ছবিটি আকি,
 এক পাশে তার জালুল পাছে
 দুটি হলুদ পাখি—
 এমনি পাখয়া এই ছবিটি
 কড়িতে নয় কেনা।

মাঠের পরে মাঠ চলেছে
 নেই বেল এর শেষ
 নালা কাজের মানুবগুলো
 আছে নানান বেশ।
 মাঠের মানুব যায় মাঠে আয়
 হাটের মানুব হাটে।
 দেখে দেখে একটি ছেলের
 সারাটি দিন কাটে।





এই ছেলেটির মুখ
সারাদেশের সব ছেলেদের
মুখেতে টুকুটুক।
কে ভূমি ভাই,
প্রশ্ন করি যখন
'ভালোবাসার শিল্পী আমি'
বলবে হেসে তখন।

‘এই যে ছবি এমন আৰা
ছবিৰ ঘতো দেশ,
দেশেৱ মাটি দেশেৱ মানুষ
লানা রকম বেশ,
বাড়ি বাগান পাৰ্খণ্যাণি
সব মিলে এক ছবি,
নেই তুলি নেই ঝঙ্গ, তবুত
আৰকতে পাৱি সবই।’

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, অর্থাৎ এদেশে সবখানেই নদী দেখা যায়। ‘স্বদেশ’ কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। একটি ছেলে সেই ছবি দেখছে ও তার মনের ভিতরে ধরে রাখছে। নদীর জোয়ার, নদীর তীরে নৌকা বেঁধে রাখা, গাছে গাছে পাখির কলকাকলি – সবই ছেলেটির মনে নিজের দেশের জন্য মায়া-মমতা ও ভালোবাসার অনুভূতি জোগাচ্ছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কড়ি টুকটুক শিল্পী পাখপাখালি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

টুকটুকে শিল্পী পাখপাখালির কড়ি

ক. এদেশে আগে এখনকার মতো টাকাপয়সা ছিল না। লোকে কেনা-বেচা
করত দিয়ে।

খ. মেলা থেকে বোনের জন্য একটা জামা কিনে আনব।

গ. জয়নুল আবেদিন ছিলেন একজন বড় মাপের চিত্র।

ঘ. বাংলাদেশের গাছে গাছে শোনা যায় কলকাকলি।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. গ্রাম বাংলার কোন ছবিটি আমাদের চেনা?

খ. কোন ছবিটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না?

গ. স্বদেশ কবিতায় কী দেখে ছেলেটির দিন কেটে যায়?

ঘ. ‘সব মিলে এক ছবি’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

৫. নিচের কথাগুলো কুবি নিই।

ক. এমনি পাঞ্চা এই ছবিটি
কড়িতে নয় কেন।



খ. মাঠের পরে মাঠ চলেছে
নেই বেন এর শেষ।



গ. এই যে ছবি এমন আৰা
ছবিৰ যতো দেশ,
দেশেৰ মাটি দেশেৰ মানুষ
নালা রকম বেশ,



বাংলাদেশ চিৰ সবুজের দেশ। সোনালি আঁশের দেশ। খস্য-
শ্যামল বাংলাদেশেৰ মাঠে মাঠে নালা ফসলেৰ খেত। গাছে
পাছে পাৰি। ঝৈকেবৈকে চলেছে অসংখ্য নদী। এৱ এক দিকে
পাহাড় আৱ অন্য দিকে সাগৰ। সবকিছুভেই প্ৰকৃতিৰ এক
অপূৰ্ব হৈয়া। শিল্পী ইং-তুলি দিয়ে এ প্ৰকৃতিৰ ছবি আৰেকেন।
কথনো কথনো তা বিকি হয়। অনেকে কিনে নেন। কিন্তু
শাস্ত-শ্যামল প্ৰকৃতিৰ এই মন জুড়ানো ছবি টাকা-পয়সা দিয়ে
কেনা যায় না।

সুজলা-সুফলা খস্য-শ্যামলা আমাদেৱ এই বাংলাদেশ। মাঠে
মাঠে ফসলেৰ খেত। বাতাস বয়ে ঘায় তাৱ ওপৰ দিয়ে।
মনে হয়, নদীৰ ঢেউ মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। অবাস্থিত খোলা
সবুজ মাঠ, মাৰে মাৰে হাম, আবাৱ মাঠ। হাম মাঠেৰ সাথে
মিশে যায়। মনে হয় সবকিছু মাঠেৰ উপাদান। মাঠেৰ পৰ
মাঠ চলে পেছে, কোথাও শেষ হচ্ছে না।

নদী, নালা, পাহাড়, সমুদ্ৰ সব মিলে এদেশ ছবিৰ যতো।
এদেশেৰ প্ৰতিটি খতু বৈচিত্ৰ্যময়। বিভিন্ন ধৰনেৰ মালুফেৱ
দেশ এটা। প্ৰকৃতি মাৰে মাৰে ইং বদলায়। যেমন ছবিতে
নালান ইং ব্যবহাৱ কৱা হয়। এদেশেৰ মানুষজনও
নালারকমেৱ বেশভূয়া পৱেন। সব মিলিমে সুন্দৰ এদেশ।



৬. ঠিক উন্নতিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. নদীর তীরে সারি সারি কী রাখা ছিল ?

- ১. জেলেদের জাল
- ২. গাছের গাঁড়ি
- ৩. খড়ের গাদা
- ৪. নৌকা

খ. ছেলেটির সারাদিন কীভাবে কাটে ?

- ১. খেলাধূলা করে
- ২. মাঠের মানুষ আর হাটের মানুষ দেখে
- ৩. পড়াশোনা করে
- ৪. বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করে

গ. ‘স্বদেশ’ কবিতায় ছেলেটি কীভাবে তার ছবি আঁকে ?

- ১. রং-তুলি দিয়ে
- ২. পেনসিল দিয়ে
- ৩. নিজের মনের মধ্যে
- ৪. মা বাবার সহযোগিতা নিয়ে

ঘ. ‘স্বদেশ’ কবিতায় কবি বাংলাদেশের কোন ছবিটি তুলে ধরেছেন ?

- ১. বাংলাদেশের শহরের মানুষের ছবি
- ২. নদীর পাড়ের জেলেদের ছবি
- ৩. বাংলাদেশের পাহাড়ি মানুষের ছবি
- ৪. বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি

ঙ. ‘এই ছেলেটির মুখ সারাদেশের সব ছেলেদের মুখেতে টুকটুক’ – কথাটি কী অর্থে বোঝানো হয়েছে ?

- ১. ছেলেটির মুখের রং
- ২. ছেলেটির মুখের গড়ন
- ৩. ছেলেটির মুখের প্রতিচ্ছবি
- ৪. ছেলেটির মুখের কথা

৭. শূন্যস্থান পূরণ করি।

‘এই যে ছবি

.....মতো দেশ,
দেশের মানুষ
 নানা রকম বেশ,
 বাড়ি বাগান
 সব মিলে এক.....
 নেই নেই তবুও
 আৰুতে পারি সবই।’

৮. ডান দিক থেকে কবিতায় ব্যবহৃত ঠিক কথাটি নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

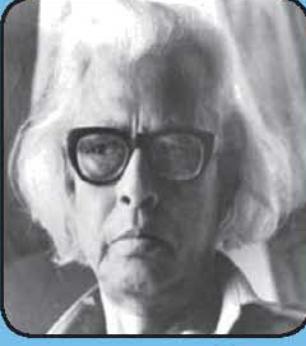
- ক. একঙা বসে আপন মনে বসে | পুকুর পাড়ে/গাছের তলে/নদীর ধারে
 খ. এমনি পাঞ্চয়া এই ছবিটি নয় কেনা। টাকায়/কড়িতে/ সোনায়
 গ. এক পাশে তার জারুল গাছে দুটি | হলুদ পাথি/জারুল ফুল /শালিক পাথি

৯. কর্ম-অনুশীলন।

নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের দেশ সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।

আমাদের দেশের নাম, দেশের সীমারেখা ও আয়তন, রাজধানী, বিভাগীয় শহর, প্রধান প্রধান নদনদী, জনসংখ্যা ও ভাষা, জাতীয় প্রতীকসমূহ (ফুল, ফল, মাছ, পশু, পাখি), প্রকৃতি ও পরিবেশ।

কবি-পরিচিতি

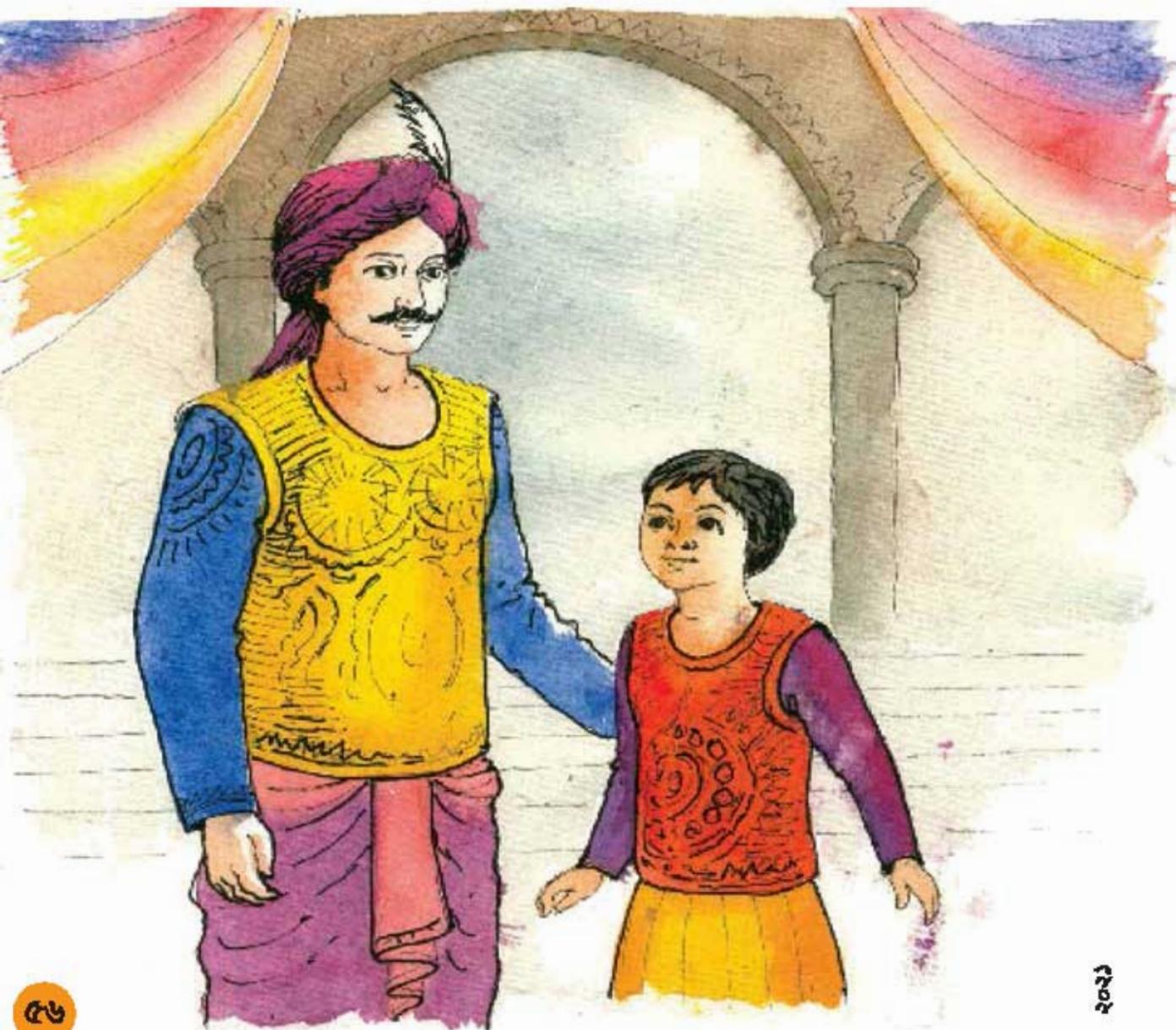


কবি আহসান হাবীব হলেন একজন বিখ্যাত বাঙালি কবি। তিনি ১৯১৭ সালে পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি প্রাচুর ছড়া ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতার ছবি ও শব্দ সহজেই মন কাঢ়ে। তিনি ছিলেন পেশায় সাহারাদিক। তিনি দীর্ঘদিন নানা পত্রিকার সহিতের পাতার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ‘বৃক্ষ পড়ে টাপুর টুপুর’ ও ‘ছুটির দিন দুপুরে’ তাঁর শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ। ১০ই জুলাই ১৯৮৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আহসান হাবীব

କାହଳମାଳା ଆର କୀକଳମାଳା

ଅନେକ ଦିନ ଆପେର କଥା । ଏକ ଦେଶେ ଛିଲ ଏକ ରାଜ୍ଞୀ । ରାଜ୍ଞୀର ଏକଟାଇ ପୁଅ । ରାଜ୍ଞୀର ସତୋ
ଦେଇ ରାଜ୍ଞୀର ରାଖାଳ ହେଲେର ଖୁବ ଭାବ । ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପରମପାତ୍ରଙ୍କେ ଖୁବ ଭାଲୋବାସେ । ରାଖାଳ ମାଠେ ଗରୁ
ଚରାଯ, ରାଜ୍ଞୀର ପାହଳାଯ ବସେ ତାର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ । ନିଯମ ଦୂପୁରେ ରାଖାଳ ବାଣି ବାଜାଯ ।
ରାଜ୍ଞୀର ତାର ବନ୍ଧୁ ରାଖାଳେର ଗଲା ଛଡ଼ିଯେ ବସେ ଦେଇ ସୁର ଶୋଲେ । ବନ୍ଧୁର ଜନ୍ୟ ବାଣି ବାଜିଯେ ରାଖାଳ
ବଡ଼ ସୁଖ ପାର । ଆର, ତା ଶୁଣେ ରାଜ୍ଞୀର ମନ ଖୁଶିତେ ବଳମଣିଯେ ଓଠେ । ରାଜ୍ଞୀର ବନ୍ଧୁର କାହେ
ଆତିଜ୍ଞା କରେ, ବଡ଼ ହରେ ରାଜ୍ଞୀ ହେଲେ ରାଖାଳକେ ତାର ଯଜ୍ଞୀ ବାନାବେ ।



তারপর একদিন রাজপুত্র রাজা হয়। লোকলস্কর, সৈন্যসামন্তে গমগম করে তার রাজপুরি। রাজপুরি আলো করে থাকে রানি কাঞ্চনমালা। চারদিকে সুখ। এত সুখের মধ্যে রাখালবন্ধুর কথা মনে পড়ে না। রাজপুত্র বন্ধুকে ভুলে যায়।

এদিকে, রাখালবন্ধুর কিন্তু খুব মনে পড়ে বন্ধু রাজপুত্রের কথা। শেষে সে একদিন চলেই আসে বন্ধুকে একটুখানি দেখার জন্য। কিন্তু রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা অমন গরিব রাখালকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না। মনতরা কষ্ট নিয়ে সারাদিন প্রাসাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে। রাজার দেখা মেলে না। দিনশেষে মনের কষ্ট নিয়ে দুঃখী রাখাল চলে যায়, কেউ তা জানে না।

এক রাতে রাজা ঘুমাতে যান। কিন্তু ভোরবেলা যখন তার ঘুম ভাঙ্গে, তখনই দেখা যায় কী সর্বনাশ ঘটেছে! রাজা দেখেন যে তার শরীরে গেঁথে আছে অগুনতি সূচ। রাজা কথা বলতে পারেন না, শুতে পারেন না, খেতেও পারেন না। রাজ্যজুড়ে কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়। রাজা বোঝেন – প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সেই অপরাধেই আজকে তার এই দশা। রানি কাঞ্চনমালা চোখের জল মুছতে মুছতে রাজ্য দেখাশোনা শুরু করেন।

কাঞ্চনমালা একদিন নদীর ঘাটে স্থান করতে যান। কোথা থেকে জানি একটা মেয়ে এলো। এসে তাকে বলে, রানির যদি দাসীর দরকার হয়, তো সে দাসী হবে। রাজার শরীর থেকে সূচ খোলার জন্য একজনের দরকার ছিল রানি কাঞ্চনমালার। মেয়েটাকে সেই কাজের জন্য নিয়ে নেন রানি। নদীর ঘাটে গেছেন রানি, সঙ্গে কী করে থাকে টাকাকড়ি! তখন হাতের সোনার কাঁকন দিয়েই রানিকে কিনতে হয় ওই দাসী। তাই তার নাম কাঁকনমালা।

গায়ের গয়নাগুলো কাঁকনমালার কাছে রেখে নদীতে ডুব দিতে যান রানি। চোখের পলকে কাঁকনমালা রানির সব গয়না আর শাড়ি পরে নেয়। রানি ডুব দিয়ে উঠে দেখেন দাসী হয়ে গেছে রানি, আর রানি কাঞ্চনমালা হয়ে গেছেন দাসী।

নকল রানি কাঁকনমালার তয়ে কাঁপতে থাকে কাঞ্চনমালা। কাঁপতে থাকে রাজপুরীর সকলে। সকলে ভাবতে থাকে, তাদের রানি তো আগে এমন ছিল না।

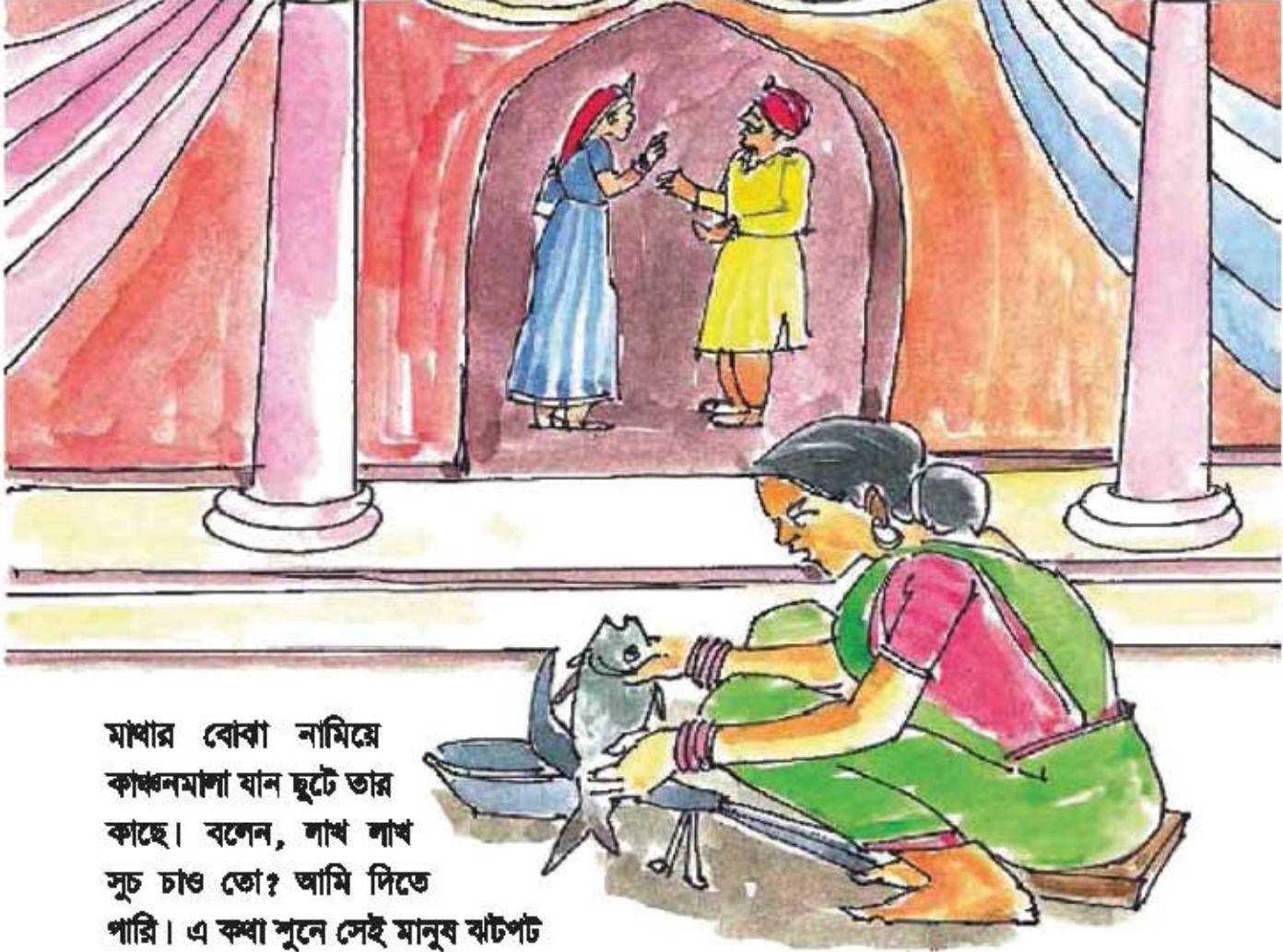
সুচিংবিধা রাজা জানতেই পারেন না, তার রাজ্য আরেক কী ঘোর ঝামেলা এসে গেছে। দুখিনী কাঞ্চনমালা রাজবাড়ির সকল কাজকর্ম করেন। চোখের জল ফেলেন।



হাতে কাঞ্চনমালার একটুও ফুরসত থাকে না। কীভাবে সুচরাজার যত্ন করবে! কীভাবে তার পাশে দ্রু-দ্রু বসবে! নকল রানি রাজার দিকে ফিরেও তাকায় না। রাজার কন্টের সীমা থাকে না। সুচবিধা শরীর ব্যথায় টলটল করে, চিলচিল করে ঝুলতে থাকে। গায়ে মাছি এসে বলে ঝোকে ঝোকে। কে তাকে বাতাস করে, কে তাকে দেখে!

একদিন নকল রানি কাঞ্চনমালাকে একসাদা কাগড় ধূতে পাঠায় নদীর ঘাটে। মাথায় কাগড়ের বোঝা নিয়ে কাঞ্চনমালা এক পা এগোন এক পা খামেন। ঢোকের জলে তাঁর বুক জেসে যেতে থাকে। এমন সময় কাঞ্চনমালা শোনেন, বনের পাশের গাছতলা থেকে কেমন এক অসুস্থ মন্ত্র। কে জানি বলেই থাক্ষে:

পাই এক হাজার সুচ
 তবে খাই তরমুজ!
 সুচ পেতাম পাচ হাজার
 তবে ঘেতাম হাট বাজার।
 যদি পাই লাখ
 তবে দেই রাজ্যপাট!



মাথার বোৰা নথিৱে

কাখনমালা যান ছুটে তাৱ

কাছে। বলেন, লাখ লাখ

সুচ চাও তো? আমি দিতে

পাৰি। এ কথা শুনে সেই মানুষ ঘটপট

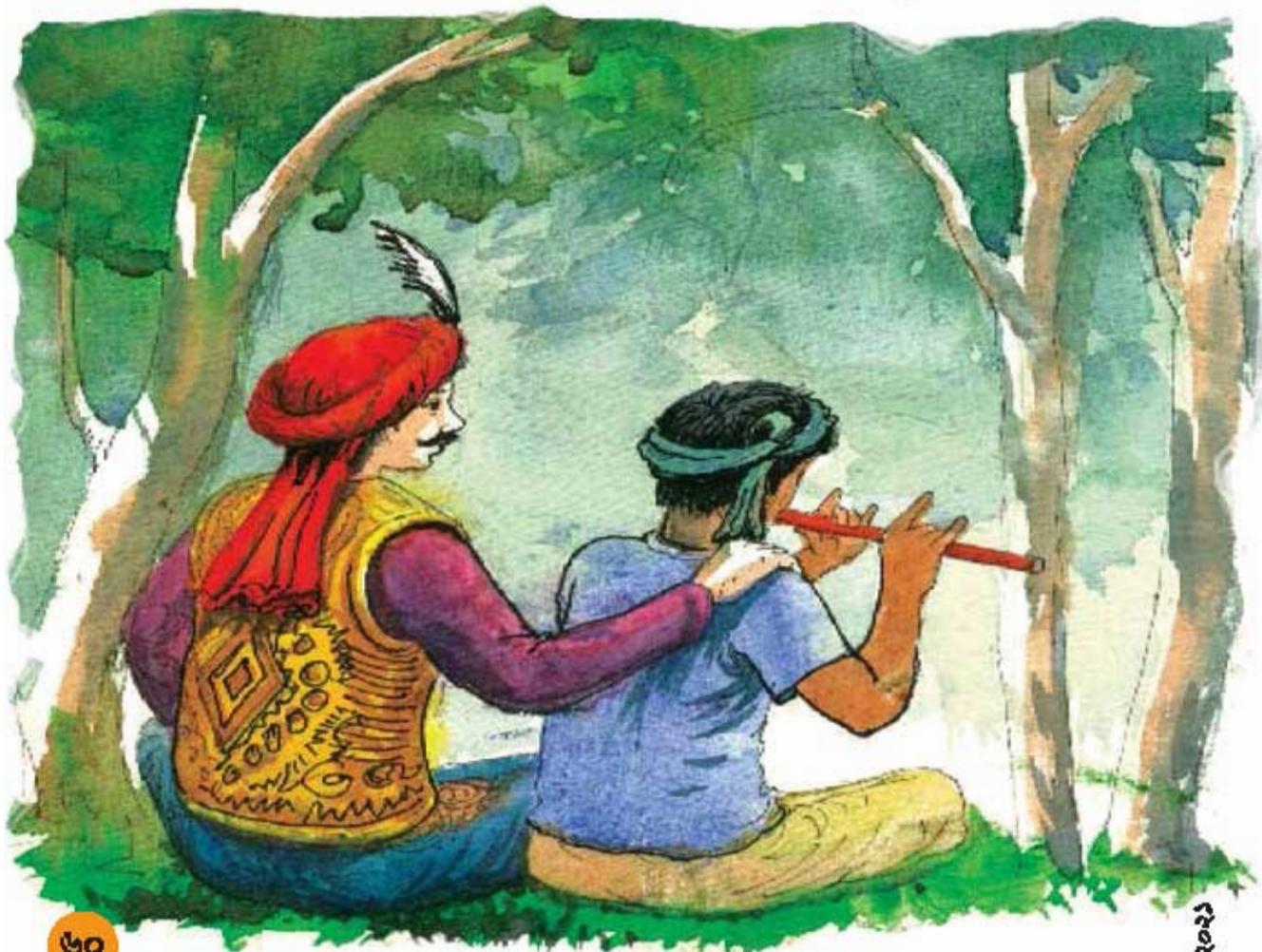
তাৱ সূতাৱ পুটলি ভুলে নিয়ে কাখনমালার সাথে হাটা ধৰে। যেতে যেতে পথে কাখনমালা
চোখের জল ফেলতে ফেলতে দুঃখের সব কথা বলে। অচেনা মানুষ শোনে, মুখ থমথমে হয়ে
যেতে থাকে তাৱ।

রাজপুরীতে গিয়ে ওই অচিন মানুষ সুচ নেবাৱ কথাটাও বলে না। বলতে থাকে অন্য কথা। বলে,
আজকেৱ দিন বড় শুভ দিন। আজ হচ্ছে পিটকুড়ুলিৰ ত্ৰত, আজকেৱ দিনে রানিদেৱ পিঠা বিলাতে
হয়— এমনই নিয়ম। নকল রানি পিঠা বানাতে যাই। সে কাখনমালাকেও পিঠা বানাতে ফরমাস
দেয়। নকল রানি বানায় পিঠা। সে পিঠা কেউ মুখেও তুলতে পাইৱ না, এমনই বিস্বাদ। দুখিনী
কাখনমালা বানান চম্পপুলি, মোহলবীশী, কীৱ মুয়লি পিঠা। মুখে দেওয়া মাত্ৰ সকলৈৱ মন ভৱে
যাই। এমনই ঝাদ তাৱ। নকল রানি উঠানে আজনা দিতে যাই। কোথাৱ নকশা কোথাৱ কী—
এখানে এক খাবলা রঁ লেপে দেওয়া, তথানে এক খাবলা লেপা। দেখতে বৈ কি অসুন্দৰ দেখায়!
আৱ কাখনমালা আৰক্ষেল গঢ়লভা। তাৱ পাশে আৰক্ষেল সোনাই সাজ কলস, ধালেৱ ছড়া, ময়ুৰ-
চু পুতুল। লোকে তখন বুৰাতে পাইৱ কে আসল রানি, আৱ কে দাসী।

তখন সেই অচেনা মানুষটা কাঁকলমালাকে ডাক দেয়, বলে—হাতের কাঁকনে কেনা দাসী, জলদি
সত্ত্ব কথা বল। কাঁকলমালার সেকি রাগ। সে গর্জে উঠে জল্লাদকে হুকুম দেয়, অচেনা মানুষ
আর কাঁকলমালার গর্ভাল নিতে। জল্লাদ খদের ধরতে আসার আগেই অচেনা মানুষ তার সূতার
শুটলিকে হুকুম দেয়। এক পোছা সূতা গিয়ে জল্লাদকে আক্টেপৃষ্ঠে বিধে কেলে। নকল রানি আবার
গর্জে উঠার আগেই অচিন মানুষ নতুন ঘন্টা ধরে:

সূতল সূতল সবুলি, কোন দেশে শর
সূচ রাজার সূচ গিয়ে আগনি পৱ।

সঙ্গে সঙ্গে শাখ শাখ সূতা রাজার গায়ের শাখ শাখ সুচে ঢুকে থায়। আবার ঘন্টা পড়ে অচিন
মানুষ। সব সূচ রাজার শরীর থেকে বেরিয়ে এসে নকল রানির চোখেমুখে বিধে থায়। ছালা
বজ্রণায় ছটফট করে। নকল রানি শেষে মারা যায়। কাঁকলমালার দুঃখের দিন শেষ হয়।



এদিকে, রাজা বহু বছর পরে চোখ মেলেন। সামনে কে যেন দাঢ়িয়ে! কে! সেই রাখালবন্ধু! রাজা দুহাতে জড়িয়ে ধরেন তাকে। রাজা ক্ষমা চান তাঁর বন্ধুর কাছে। কথা দিয়ে কথা রাখেন নি। রাজা বলেন, “আজ থেকে তুমি আমার মন্ত্রী। এই রাইল রাজ্য আমার, শুধু তুমি আমার পাশে থেকো! সারা জীবনের জন্য থেকো!” রাখাল বন্ধু কি তখন না থেকে পারে!

রাজা তাঁর বন্ধুকে নতুন সোনার বাঁশি গড়িয়ে দেন। রাখাল সারাদিন মন্ত্রীর কাজ করে, প্রজাদের দুঃখ সরিয়ে তাদের মুখে হাসি আনে। সারাদিনের কাজ শেষে রাজা বন্ধুকে নিয়ে যান। পুরানো দিনের মতো রাখালবন্ধু তখন বাঁশি বাজায়, আর রাজা সেই সূর শোনেন। সুখে রাজার মন ভরে ওঠে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

আফেপৃষ্ঠে গর্দান গর্জে ওঠা স্বাদ বিস্বাদ পুটলি ফরমাস ঘোর ফুরসত
টনটন চিনচিন মায়াবতী কাঁকন রক্ষী রাজপ্রাসাদ পরস্পর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পরস্পরের বিস্বাদ আফেপৃষ্ঠে পুটলিটি ফুরসত টনটন

ক. তার হাতের রান্না এমন যে মুখেই তোলা যায় না।

খ. বৃন্দ লোকটি তার স্যন্তে একপাশে রেখে দিল।

গ. লোকটির কাজের চাপ এত বেশি যে দম ফেলার নেই।

ঘ. তার সমস্ত শরীর ব্যথায় করছে।

ঙ. তারা দুজন বন্ধু।

চ. গ্রামের মায়া ছেলেটিকে বেঁধে রেখেছে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. রাজপুত্র কোথায় বসে রাখালবন্ধুর বাঁশি শুনত?
- খ. রাজপুত্র রাখালবন্ধুর কথা ভুলে যায় কেন?
- গ. রাজা কেন মনে করলেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণেই তাঁর এই দশা?
- ঘ. তোমার মা বাড়িতে কী ধরনের পিঠা বানায় লেখ?
- ঙ. অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে না এলে কী হতো?
- চ. তুমি কী মনে কর অচেনা লোকটির কারণেই রাজার প্রাণ রক্ষা পেল?
- ছ. কীভাবে লোকেরা নকল রানিকে বুঝে ফেলল?
- জ. রাজা কীভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন?
- ঝ. কাথনমালা এবং কাঁকনমালার চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর।
- ঝঃ. গল্পটা তোমার কেমন লেগেছে? বর্ণনা দাও।

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কানা	হাসি	চেনা	অচেনা	ভালো	মন্দ	বড়	ছোট	আলো	অন্ধকার
------	------	------	-------	------	------	-----	-----	-----	---------

- ক. সন্তানের মৃত্যুতে তিনি ধরে রাখতে পারলেন না।
- খ. লোকটির ফাঁদে পা দিয়ে সে তার সবকিছু হারিয়েছে।
- গ. রাসেল বয়সে হলেও সংসারের অনেক কাজে মাকে সাহায্য করে।
- ঘ. লোকটিকে আমি কোথায় যেন দেখেছি, খুব মনে হচ্ছে।
- ঙ. বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় চারদিকে নেমে এলো।

৫. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

নিম্ন সুখ রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা টন্টন ময়ূর পদ্মলতা চিনচিন ঝলমল বাঁশি রাজ্য

৬. নিচের বাক্যাংশ ও বাক্যগুলো পড়ি।

ব্যথায় টন্টন করা – খুব ব্যথা করা। সুচিংবিধা রাজার শরীর দিনরাত ব্যথায় টন্টন করত।

খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠা – মন আনন্দে ওঠে। রাখাল বন্ধুর বাঁশির সুর শুনে রাজপুত্রের
মন খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠত।

৭. গল্পে ‘টন্টন’, ‘থমথম’ এ রকম শব্দ আছে। এই ধরনের আরও কয়েকটি শব্দের ব্যবহার শিখি (এখানে একটি দেখানো হলো)।

তন্তন – চারদিকে মাছি তন্তন করছে।

টন্টন –

থৈথৈ –

রইরই –

কনকন –

বনবন –

৮. বিপরীত শব্দ শিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য শিখি।

সুখ	দুঃখ	মা-বাবার মনে কখনো দুঃখ দেয়া উচিত নয়।
মায়া
স্বাদ
কষ্ট
নকশ
রানি
রাজপুত্র
অসুস্মর
খুশি

৯. যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করে পড়ি ও শিখি।

শ্ব – ব্রহ্মপুত্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ক্ষ – পরিপক্ষ, ক্ষুচিৎ

ঙ্গ – গঞ্জার, পাষণ্ড

ণ্ট – ঘণ্টা, কণ্টক

অবাক জলপান

সুকুমার গ্রাম

গান্ধীজি : পরিষিক | বৃক্ষিষ্ণুলা | বৃক্ষ | ছেকরা | খোকা | মামা |

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

(যাতা মাথায় এক পরিষিকের প্রবেশ। পিঠে শাস্তির আশার লোটা-বীষা শুটলি। উদ্ভক্ষক হৃণ। আবৃ চেহারা)

পরিষিক : নাও একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি। তেক্ষণ মগজের ষিলু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল। বিস্তু জল চাই কার কাছে?



গেরন্টৰ বাড়ি, দুপুর রোদে দৱজা এঁটে সব ঘূম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চ্যাঁচাতে গেলে হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও লোকজন দেখছি নে। – ওই একজন আসছে! ওকেই জিজেস করা যাক।

[বুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ]

পথিক : মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

বুড়িওয়ালা : জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান তো দিতে পারি –

পথিক : না, না আমি তা বলি নি –

বুড়িওয়ালা : না, কাঁচা আম আপনি বলেন নি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা তো আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম –

পথিক : না হে, আমি জলপাই চাচ্ছিলে –

বুড়িওয়ালা : চাচ্ছেন না তো, ‘কোথায় পাব’ ‘কোথায় পাব’ কচ্ছেন কেন? খামাখা এরকম করবার মানে কী?

পথিক : আপনি ভুল বুঝছেন – আমি জল চাচ্ছিলাম –

বুড়িওয়ালা : জল চাচ্ছেন তো ‘জল’ বললেই হয় – ‘জলপাই’ বলবার দরকার কী? জল আর জলপাই কি এক হলো? আলু আর আলুবোথরা কি সমান? মাছও যা আর মাছরাঙ্গাও তাই? বরকে কি আপনি বরকম্বাজ বলেন? চাল কিনতে গিয়ে কি চালতার খোঁজ করেন?

পথিক : ঘাট হয়েছে মশাই। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।

বুড়িওয়ালা : অন্যায় তো হয়েছেই। দেখছেন বুড়ি নিয়ে যাচ্ছি – তবে জল চাচ্ছেন কেন? বুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়।

[বুড়িওয়ালার প্রস্থান]

[পাশের বাড়ির জানালা খুলিয়া এক বৃন্দের হাসিমুখ বাহিরকরণ]

বৃন্দ : কী হে? এত তর্কাতর্কি কিসের?

পথিক : আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাচ্ছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না – কেবলই সাত-পাঁচ গপ্পো করতে লেগেছেন। তাই বলতে গেলুম তো রেগেমেগে অস্থির।

বৃন্দ : আরে দূর দূর। তুমিও যেমন! জিজেস করবার আর লোক পাও নি? ও হতভাগা জানেই বা কী আর বলবেই বা কী? ওর যে দাদা আছে, খালিসপুরে চাকরি করে।

- সেটা তো একটা আন্ত গাধা। ও মুখ্যটা কী বলবে তোমায় ?
- পথিক** : কী জানি মশাই-জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামা-বাড়ির জল বলে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে-
- বৃন্দ** : হঁঁঁঁ-ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি। তোমায় বোকামতো দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি তো ফর্দ করেছেন, আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তো আমি এক্ষুণি পঁচিশটা বলে দেব -
- পথিক** : না মশাই, গুনিনি-আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই -
- বৃন্দ** : তোমার কাজ না থাকলেও আমার কাজ থাকতে পারে তো? যাও, যাও, মেলা বকিয়ো না-একেবারে অপদার্থের একশেষ।

[বৃন্দের সশঙ্কে জানালা বন্ধকরণ]

[নেপথ্যে বাড়ির ভিতরে বালকের পাঠ]

- [পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল।
সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ।]
- পথিক** : ওহে খোকা! এদিকে শুনে যাও তো?
- [রুক্ষমূর্তি, মাথায় টাক, লম্বা দাঢ়ি খোকার মামা বাড়ি হইতে বাহির হইলেন]
- মামা** : কে হে? পড়ার সময় ডাকাডাকি করতে এয়েছ? - (পথিককে দেখিয়া) ও! আমি মনে করেছিলুম পাড়ার কোনও ছোকরা বুঝি! আপনার কী দরকার?
- পথিক** : আজ্ঞে, জলতেষ্টায় বড় কষ্ট পাচ্ছি-তা একটু জলের খবর কেউ বলতে পারলে না।
- [মামার তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া দেওয়া]
- মামা** : কেউ বলতে পারলে না? আসুন, আসুন, কী খবর চান, কী জানতে চান, বলুন দেখি? সব আমায় জিজ্ঞেস করুন, আমি বলে দিচ্ছি।
- [পথিককে মামার ঘরে টানিয়া নেওয়া]

ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ

ଘରେର ଭିତର

[ଘର ନାନା ରକମ ଯତ୍ର, ନକଶା, ରାଶି-ରାଶି ବିହିତ ସଜ୍ଜିତ]

- ମାମା : କୀ ବଲଛିଲେନ ? ଜଳେର କଥା ଜିଜ୍ଞେସ କରଛିଲେନ ନା ?
- ପଥିକ : ଆଜେ ହଁ, ସେଇ ସକାଳ ଥେକେ ହାଁଟିତେ ହାଁଟିତେ ଆସଛି !
- ମାମା : ଆ ହା ହା ! କୀ ଉତ୍ସାହ, କୀ ଆଗ୍ରହ ! ଶୁନେଓ ସୁଖ ହୟ । ଏରକମ ଜାନବାର ଆକାଙ୍କ୍ଷା କରନେର ଆଛେ, ବଲୁନ ତୋ ? ବସୁନ ! ବସୁନ ! (କତକଗୁଲି ଛବି, ବିହିତ ଆର ଏକ ଟୁକରୋ ଖଡ଼ି ବାହିର କରିଯା) ଜଳେର କଥା ଜାନତେ ଗେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜାନା ଦରକାର, ଜଳ କାକେ ବଲେ, ଜଳେର କୀ ଗୁଣ -
- ପଥିକ : ଆଜେ, ଏକଟୁ ଖାବାର ଜଳ ଯଦି -
- ମାମା : ଆସଛେ - ବ୍ୟନ୍ତ ହବେନ ନା । ଏକେ ଏକେ ସବ କଥା ଆସବେ । ଜଳ ହଚ୍ଛେ ଦୂରଭାଗ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆର ଏକଭାଗ ଅଞ୍ଜିଜେନ ।
- ପଥିକ : ଏହି ମାଟି କରେଛେ !
- ମାମା : ବୁଝଗେନ ? ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଯ ଜଳକେ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରଲେ ହୟ-ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆର ଅଞ୍ଜିଜେନ । ଆର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆର ଅଞ୍ଜିଜେନେର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ହଲେଇ, ହବେ ଜଳ ! ଶୁନ୍ଛେନ ତୋ ?
- ପଥିକ : ଦେଖୁନ ମଶାଇ ! କୀ କରେ ଯେ କଥାଟି ଆପନାଦେର ମାଥାଯ ଢୋକାବ ତା ଭେବେ ପାଇଲେ । ବଲି, ବାରବାର କରେ ଯେ ବଲଛି- ତେଣ୍ଟାଯ ଗଲା ଶୁକିଯେ କାଠ ହେଁ ଗେଲ, ସେଟା ତୋ କେଉ କାନେ ନିଛେନ ନା ଦେଖି । ଏକଟା ଲୋକ ତେଣ୍ଟାଯ ଜଳ ଜଳ କରଛେ, ତବୁ ଜଳ ଖେତେ ପାଯ ନା, ଏରକମ କୋଥାଓ ଶୁନ୍ଛେନ ?
- ମାମା : ଶୁନେଛି ବହିକି, ଚୋଖେ ଦେଖେଛି । ବଦିନାଥକେ କୁକୁଡ଼େ କାମଡ଼ାଳ, ବଦିନାଥେର ହଲୋ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିଆ- ଯାକେ ବଲେ ଜଳାତଙ୍କ । ଆର ଜଳ ଖେତେ ପାରେ ନା-ଯେଇ ଜଳ ଖେତେ ଯାଯ ଅମନି ଗଲାଯ ଥିଚ ଧରେ । ମହା ମୁଶକିଲ ।
- ପଥିକ : ନାଃ ଏଦେର ସଙ୍ଗେ ପେରେ ଓଠା ଗେଲ ନା- କେନଇ ମରତେ ଏସେଛିଲାମ ଏଖାନେ ? ବଲି ମଶାଇ, ଆପନାର ଏଖାନେ ନୋହା ଜଳ ଆର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜଳ ଛାଡ଼ା ଭାଲୋ ଜଳ ଖୌଟି ଜଳ କିଛୁ ନେଇ ?
- ମାମା : ଆହେ ବହିକି ! ଏହି ଦେଖୁନ ନା ବୋତଳ-ଭରା ଟାଟକା ଖୌଟି ଡିସଟିଲ ଓଯାଟାର-ଯାକେ ବଲେ ପରିଶୁତ ଜଳ ।



[বড় সবুজ একটি বোতল আনিয়া মামা পথিককে দেখাইলেন]

পথিক
মামা

- : (ব্যস্ত হইয়া) এ জল কি খায়?
: না, ও জল খায় না, উভে তো স্বাদ নেই— এফেবাংকে বোবা জল কিনা, এইমাত্র
তৈরি করে আনল— এখনও গরম রয়েছে।

[পথিকের হতাশ ভাব]

তারপর যা বলহিলুম শুনুন— এই যে দেখছেন গুরুত্বপূর্ণ নোতো জল— এর মধ্যে
দেখুন এই গোলাপি জল চেলে দিলুম— ব্যস, গোলাপি রঁ উড়ে সাদা হয়ে গেল।
দেখলেন তো?

- পথিক
মামা
- : না মশাই, কিছু দেখি নি, কিছু বুবতে পারি নি, কিছু মানি না ও কিছু বিশ্বাস করি না।
: কী বললেন। আমার কথা বিশ্বাস করেন না!
: না, করি না। আমি যা চাই, তা বক্ষল দেখাতে না পারবেন, ততক্ষণ কিছু
বিশ্বাস করব না।

- মামা** : বটে, কোনটা দেখতে চান একবার বলুন দেখি— আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।
- পথিক** : তা হলে দেখান দেখি। সাদা, খাঁটি চমৎকার এক গেলাস খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি। যাতে গন্ধ নেই, পোকা নেই, কলেরার পোকা নেই, ময়লা-টয়লা কিছু নেই, তা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখান দেখি। খুব বড় এক গেলাস ভর্তি জল নিয়ে দেখান তো!
- মামা** : এক্ষুণি দেখিয়ে দিচ্ছি— ওরে ট্যাপা, দৌড়ে আমার কুঁজো থেকে এক গেলাস জল নিয়ে আয় তো।

[পাশের ঘরে দুপদাপ শব্দে খোকার দৌড়]

নিয়ে আসুক, তারপর দেখিয়ে দিচ্ছি। ওই জলে কী রকম হয়, আর নোংরা জলে কী রকম তফাত হয়, আমি সব দেখিয়ে দিচ্ছি।

[জল লইয়া ট্যাপার প্রবেশ]

এই খানে রাখ।

[জল রাখিবামাত্র পথিকের আকৃমণ—মামার হাত হইতে জল

কাড়িয়া এক নিঃশ্বাসে চুমুক দিয়া শেষ করা]

- পথিক** : আঃ বাঁচা গেল!
- মামা** : (চটিয়া) এটা কী রকম হলো মশাই?
- পথিক** : পরীক্ষা হলো— এক্সপেরিমেন্ট। এবার আপনি নোংরা জলটা একবার খেয়ে দেখান তো? কীরকম হয়?
- মামা** : (ভীষণ রাগিয়া) কী বললেন?
- পথিক** : আচ্ছা থাক, এখন নাই বা খেলেন— পরে খাবেন। আর গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সবকটাকে খানিকটা করে খাইয়ে দেবেন। তারপর খাটিয়া তুলবার দরকার হলে আমায় খবর দেবেন— আমি খুশি হয়ে ছুটে আসব, হতভাগা জোচোর কোথাকার।

[পথিকের দ্রুত প্রস্থান]

[পাশের গলিতে সুর করিয়া সে হাঁকিতে লাগিল – ‘অবাক জলপান’]

অনুশীলনী

১. নাটকাটির মূলভাব জেনে নিই।

সুকুমার রায়ের ‘অবাক জলপান’ ছেউ একটি নাটক। এতে একটি গল্প বলা হয়েছে। তবে পথিক, ঝুড়িওয়ালা, বৃদ্ধ, খোকার মামা— এই চারজন লোকের কথোপকথন বা সংলাপের মধ্য দিয়ে গল্পটি বলা হয়েছে বলে এটি নাটক। ছেউ নাটককে নাটক বলে। ‘অবাক জলপান’ নাটকার কাহিনি হচ্ছে— ভীষণ তৃষ্ণার্ত একটি লোক তেষ্টায় নানান জনের কাছে গিয়ে জল চাইছে, কিন্তু কেউ তাকে জল দিচ্ছে না। বরং তার কথা বলার মধ্যে নানারকম খুঁত ধরছে। শেষ পর্যন্ত বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে ফন্দি এঁটে এক বিজ্ঞানীর নিকট থেকে সে জল আদায় করল। এটি একটি হাসির গল্প।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গেরস্ট বরক্সাজ তেষ্টা খাটিয়া এক্সপেরিমেন্ট বুক্ষমূর্তি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

গেরস্ট বরক্সাজ এক্সপেরিমেন্ট তেষ্টায় বুক্ষমূর্তি খাটিয়ার

ক. বাড়ি, দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে।

খ. বরকে কি আপনি বলেন?

গ. একটা লোক জল জল করছে, তবু জল থেতে পায় না।

ঘ. পথিক ক্লান্ত হয়ে অবশ্যে ওপর বসে পড়ল।

ঙ. নোংরা জলের ভিতর কী আছে তা করে বলা যাবে।

চ. লোকটিকে দেখলেই ভয় লাগে।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও শিখি।

- ক. ‘বোবা জল’ বলতে কী বোঝায় ?
- খ. ‘জলাতঙ্ক’ কাকে বলে ?
- গ. জলের তেষ্টায় পথিকের মন ও শরীরের অবস্থা কী হয়েছিল ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মনে কর এই পথিকের সঙ্গে তুমি কথা বলছ। তোমাদের দু জনের কথোপকথন কেমন হতে পারে তা নিজের ভাষায় লেখ।
- ঙ. পথিককে ঝুড়িওয়ালা কত রকম জলের কথা শুনিয়েছিল ? নামগুলো লেখ।
- চ. তুমি তোমার সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে ইচ্ছেমতো একটি নাটিকা লেখ।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. অবাক জলপান কোন ধরনের রচনা ?

- | | |
|------------|------------|
| ১. নাটিকা | ২. ছোটগল্ল |
| ৩. প্রবন্ধ | ৪. উপন্যাস |

খ. পথিক ঝুড়িওয়ালার কাছে কী চেয়েছিল ?

- | | |
|-------------|------------|
| ১. কাঁচা আম | ২. জল |
| ৩. জলপাই | ৪. পাকা আম |

গ. কুকুরে কামড়ালে মামা কোন রোগের কথা বলেছিল ?

- | | |
|---------------|-------------|
| ১. ডিপথেরিয়া | ২. আমাশয় |
| ৩. জলাতঙ্ক | ৪. টাইফয়েড |

ঘ. পথিক কয়জনের কাছে খাবার জল চেয়েছিল ?

- | | |
|---------|---------|
| ১. ৪ জন | ২. ৩ জন |
| ৩. ২ জন | ৪. ৫ জন |

ঙ. বৃদ্ধ পথিককে কয় ধরনের জলের কথা বলতে চেয়েছিল ?

- | | |
|----------|----------|
| ১. পঁচিশ | ২. ত্রিশ |
| ৩. দশ | ৪. সাতাশ |

চ. পথিক শেষ পর্যন্ত কার কাছ থেকে খাবার জল পেয়েছিল?

- | | |
|----------------|----------|
| ১. বালক | ২. মামা |
| ৩. ঝুড়িওয়ালা | ৪. বৃন্দ |

ছ. নাটিকাটিতে বিজ্ঞানীর চরিত্রে কাকে দেখানো হয়েছে?

- | | |
|----------------|----------|
| ১. ঝুড়িওয়ালা | ২. বৃন্দ |
| ৩. বালক | ৪. মামা |

৫. কর্ম-অনুশীলন

শিক্ষকের সহায়তায় নাটিকাটি শ্রেণিতে ধারাবাহিকভাবে অভিনয় করি।



সুকুমার রায়

কবি-গবিন্দিতি

শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটদের জন্য হাসির গল্প ও কবিতা লিখেছেন। ‘আবোল-তাবোল’, ‘হ-য-ব-র-ল’, ‘পাগলা দাশু’, ‘বহুরূপী’, ‘খাইখাই’, ‘অবাক জলপান’ তাঁর অমর সূচিটি। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীও শিশুসাহিত্যিক ছিলেন, আর পুত্র সত্যজিৎ রায় বিশ্ববিদ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক হয়েও শিশু-কিশোরদের জন্য প্রচুর লিখেছেন। ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে সুকুমার রায় মৃত্যুবরণ করেন।

ଶାସକୁଳ

ଜ୍ୟୋତିରିନ୍ଦ୍ର ମୈତ୍ର

ଆମରା ଘାସେର ଛୋଟ ଛୋଟ କୂଳ
ହାତରାତେ ଦୋଲାଇ ଯାଏଥା,
ଫୁଲୋ ନା ମୋଦେର ଦଲୋ ନା ପାଇଁ
ଛିଡ଼ ନା ନରମ ପାତା ।

ଶୁଦ୍ଧ ଦେଖ ଆର ଶୁଣି ହେଉ ମନେ
ସୂର୍ଯ୍ୟର ସାଥେ ହାସିର କିରଣେ
କେମନ ଆମରା ହେସେ ଉଠି ଆର
ଦୂଲେ ଦୂଲେ ନାଢ଼ି ଯାଏଥା ।

ଧରାଇ ବୁକେ ଦ୍ରେହ କଣାଗୁଣି
ଘାସ ହରେ ଫୁଟେ ଭଟେ ।
ମୋରା ତାରଇ ଶାଳ ନୀଳ ସାଦା ହାସି
ବୁନ୍ଧକଥା ନୀଳ ଆକାଶେର ବୀପି—
ଶୁଣି ଆର ଦୂଲି ବାତାସେ
ଯଥନ ତାରାରା ଫୋଟେ ।

অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

ঘাসফুল যে কী আনন্দে বেঁচে আছে, জীবনকে উপভোগ করছে সে কথাই এখানে তারা নিজেরা বলছে। ফুল ছিড়ে, পায়ের নিচে পিষে ফেলে মানুষ যেন তাদের কষ্ট না দেয়—সেই মিনতি তারা করছে। গাছে ফুল ফুটলে তা দেখে আনন্দ পাওয়া চাই। ফুল ছেঁড়ার অর্থ ফুলকে মেরে ফেলা। গাছের যেমন প্রাণ আছে, ফুলেরও তেমনই প্রাণ আছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দোলাই কিরণ ধরা তারারা ফোটে স্নেহ-কণা রূপকথা

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দোলায় কিরণ ধরার তারারা স্নেহ-কণা রূপকথার ফোটে

ক. ছোট ছোট ফুল হাওয়াতে মাথা।

খ. সকালে সূর্যের ততটা তীব্র হয় না।

গ. বুকের স্নেহ-কণাগুলি ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।

ঘ. আঁধার আকাশে মিটিমিটি করে চায়।

ঙ. ফুল গাছে ফুল।

চ. বই পড়তে অনেক ভালো লাগে।

ছ. মা দিয়ে আমাদের তরে রাখেন।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. হাওয়াতে কারা মাথা দোলাচ্ছে?

খ. ঘাসফুল আমাদের কাছে কী মিনতি করছে? কেন করছে?

গ. ঘাসফুল কার সাথে নিজেকে তুলনা করেছে? কীভাবে তুলনা করেছে?

ঘ. ফুল মানুষকে কীভাবে আনন্দ দেয়?

५. कवितार अन्ति याख्या करि।

ମୋରା ତାରଇ ଲାଲ ନୀଳ ସାଦା ହାସି
ରୂପକଥା ନୀଳ ଆକାଶର ବୀଣି—
ଶୁଣି ଆଉ ଦୁଲି ଶାନ୍ତ ବାତାମେ
ଯଥନ ତାରାରା ଫୋଟେ ।

୬. କବିତାଟି ଆବୁଦ୍ଧି କରି ଓ ନା ଦେଖେ ଶିଥି ।

१. कर्म-अनुशीलन ।

ক. আমার শ্রিয় ফুল সংস্করে একটি রচনা লিখি।

ଫୁଲେର ନାମ :

ফুলের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা:

କୋଣାର୍କ ହୃଦୟ:

ବ୍ୟବହାର :

କେଳ ପିଲ୍ ଫୁଲ:

.....
.....
.....
.....
.....

କୁର୍ବି-ଗ୍ରିଚିଡ଼ି



জ্যোতিরিস্ত্র মৈত্র ১৯১১ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত কবি ও গায়ক। তিনি অনেক উদ্দীপনামূলক দেশপ্রেমের গান লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। সংগীতের শিক্ষক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। তিনি ১৯৭৭ সালের ২৬শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମୈତ୍ରୀ

মাটির নিচে যে শহর

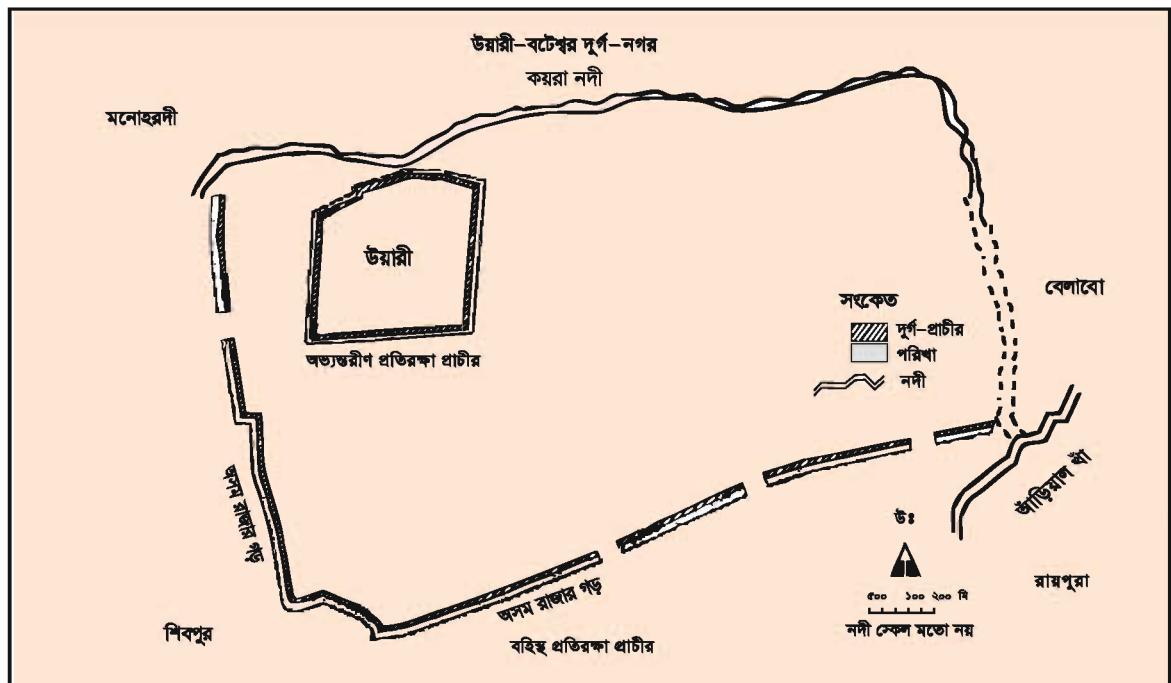
বাংলাদেশের মধ্যে বেশ কয়েকটা প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে। সে সব স্থানের নাম তোমরা হয়তো জান, যেমন— ময়নামতি, মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুর। এগুলো কোনোটি হয়তো তোমরা দেখেও থাকবে। সেগুলো সবই মাটির উপরে, ঢিবির আকারে, তাই সহজে দূর থেকেই দেখা যায়। কিন্তু এদেশে মাটির নিচে রয়েছে এক প্রাচীন নগর-সভ্যতা।



প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

কুমিল্লার লালমাই আৱ বৰেন্দ্ৰ অঞ্চলের পাহাড়পুর এবং মহাস্থানগড়ের মতো মধুপুর গড়ের অধিকাংশ ভূমিৰ পঠন একই রকম। এ অঞ্চল মধুপুর গড় নামে পরিচিত। মৃষ্টিকা-বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই অঞ্চলের মাটি হাজার হাজার বছৰের পুৱালো। আজ থেকে বহু বছৰ আগে আমাদের এই দেশেৱ ভূগূঢ় ঠিক এই রকম ছিল না। প্রিমে সাত থেকে ছয় শতকে বর্তমানেৱ গঙ্গা নদীৰ তীৰে সুসভ্য জনমানন্দেৱ বসতি ছিল। এখানে ছিল সুন্দৱ নগৰী। এখনকাৱ নৱসিংহদী দিয়ে বয়ে গেছে পুনৰ্বৃত্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ। ১৭৭০ সাল পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ ময়মনসিংহ পোৱিয়ে নৱসিংহদী জেলায় বেলাবো উপজেলায় দক্ষিণ দিক থেকে প্রাচীন সোনারগী নগৰেৱ পাশ দিয়ে প্ৰবাহিত ছিল।

এরপর সম্ভবত বড় ভূমিকম্প, বন্যা-প্লাবন বা নদীভাঙেন হয়েছিল কোনো এক সময়ে। ফলে এসব অঞ্চলে ভূপ্রকৃতির বড় রকমের ওলটপালট হয়। ১৮৯৭ সালে প্রচন্ড এক ভূমিকম্প হয় আমাদের দেশে। ফলে মাঠ-ঘাট, নদী-নালা আর জনবসতি সবই প্রাকৃতিক কারণে বদলে যায়। এখনো তোমরা দেখে থাকো নদীর পাড়ের জমি, ঘরবাড়ি, গ্রাম আর রাস্তা-ঘাট ভাঙ্গে। আবার বিশাল নদীর অন্য দিকে বিস্তীর্ণ চর পড়ে। শত শত বছর আগে থেকেই এইভাবে চলে আসতে থাকে ভাঙ্গা-গড়া। মাটিচাপা পড়ে যায় এক একটি নগর-জনপদ। মাটি ঝুঁড়ে এমনি এক সুপ্রাচীন নগর-জনপদের দেখা পাওয়া গেছে বাংলাদেশে। সেই স্থানের নাম নরসিংহদী জেলার উয়ারী-বটেশ্বর। উয়ারী-বটেশ্বর ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নরসিংহদীর বেলাবো ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত। এটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান।



আসলে উয়ারী এবং বটেশ্বর পাশাপাশি দুটি গ্রাম। এই দুই গ্রামে প্রায়ই বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া যেত। ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খনন করার সময় একটা পাত্রে জমানো কিছু মুদ্রা পায়। স্থানীয় স্কুল শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান সেখান থেকে ২০-৩০টি মুদ্রা সংগ্রহ করেন। এগুলো ছিল বঙ্গদেশের এবং ভারতের প্রাচীনতম রৌপ্যমুদ্রা। সেটাই ছিল উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন সংগ্রহের প্রথম চেষ্টা। তিনি তাঁর ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠানকে এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। ১৯৫৫ সালে বটেশ্বর গ্রামের শ্রমিকরা দুটি লৌহপিণ্ড ফেলে যান। ত্রিকোণাকার ও একমুখ চোখা ভারি লোহার পিণ্ডগুলো হাবিবুল্লাহ পাঠান বাবাকে নিয়ে

দেখান। তিনি অভিভূত হন। ১৯৫৬ সালে উয়ারী থামে মাটি খননকালে ছাপাইক্কত ক্রোপ্য মুদ্রার একটি ভাঙার পান তিনি। তাতে চার হাজারের মতো মুদ্রা ছিল। ১৯৭৪-৭৫ সালের পর থেকে হাবিবুল্লাহ উয়ারী-বটেশ্বরের আচুর প্রাচীন নিদর্শন সঞ্চাহ করেন। পরে তিনি সেগুলো জাহাজীরনগর জমা দেন। অনেক পরে ২০০০ সালে এখানে শুরু হয় খনন কাজ। নেতৃত্ব দেন জাহাজীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফুল্ল বিভাগের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান। খনন করে পাওয়া যায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ-নগর। আরও পাওয়া যায় ইটের স্থাপত্য, বসন্ত, রাস্তা, গলি, পোড়ামাটির বলক, মূল্যবান পাথর, পাথরের বাটখানা, কাঠের শৈলি, মুদ্রাভাগার। মুদ্রাগুলো তারত উপমহাদেশের মধ্যে প্রাচীনতম। বিশ্বজগদের ধারণা, মাটির নিচে থাকা এই স্থানটি থায় আড়াই হাজার বছরের পুরানো।

সে সময় শীতলক্ষ্য নদীর পাড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস। ছিল নগর সভ্যতা। পূর্ব-দক্ষিণ দিকে দিমে তৈরবের মেঘনা হয়ে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য সুদূর জনপদ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ঐতিহাসিকদের ধারণা, ব্রহ্মপুত্র নদ হয়ে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সুদূর মোগান সাম্রাজ্য পর্যন্ত ‘উয়ারী-বটেশ্বর’ রাজ্যের যোগাযোগ ছিল।



প্রাচীন মুদ্রা

উয়ারী-বটেশ্বরের আশেপাশে থায় পঞ্চশটি পুরানো জায়গা পাওয়া গেছে। আশেপাশের বিভিন্ন থাম, বেমন-রাজার টেক, সোনালুক্তা, কেন্দুয়া, মরজাল, টঙ্গীরাজার বাড়ি, মন্দিরভিটা, জানবাইরটেক, টঙ্গীরটেকে প্রাচীন বসতির টিক পাওয়া যায়। দুর্গ-প্রাচীর, ইটের স্থাপত্য, মুদ্রা, গয়না, ধাতব বস্তু, অস্ত্র থেকে শুরু করে জীবনধারণের বত প্রফুল্ল পাওয়া গেছে তা থেকে সহজেই বলা যায়, এখানকার মানুষ যথেষ্ট সভ্য ছিল। এই স্থানের বসতি এলাকাটি সম্ভবত রাজ্যের রাজধানী ছিল। অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের ধারণা, এই প্রফুল্ল স্থাপত্য অস্ত্যন্ত সমূল্য আৰু যথাযথ পরিকল্পনায় গড়া। এই সভ্যতা প্রাচীনকালে ‘সোনালুক্তা’ নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল। উয়ারী-বটেশ্বর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শিবপুর উপজেলা। এখানকার মন্দিরভিটার এক বৌদ্ধ পঞ্চমন্দিরও আবিষ্কৃত হয়েছে। জানবাইরটেকে একটি বৌদ্ধবিহারের স্মৃতান পাওয়া গেছে। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক আচর্ষ সব নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে এই এলাকা থেকে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

প্রত্নতাত্ত্বিক জনপদ প্রাচীনতম অভিভূত নির্দেশন খ্রিস্টপূর্ব ঐতিহাসিক

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঐতিহাসিক

উপত্যকা

অভিভূত

নির্দেশন

প্রাচীনতম

ক. পাহাড়পুর আমাদের দেশে অতি একটি বিহার।

খ. ক্রমে ক্রমে অনেক আশ্চর্য পাওয়া যাচ্ছে উয়ারী-বটেশ্বরে।

গ. উয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশের নির্দেশন।

ঘ. পাহাড় ও পর্বতের মাঝে সমতল ভূমিকে বলে।

ঙ. আমি জানুম দেখে হয়ে গেলাম।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশন বলতে কী বোঝা? বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশনগুলি সম্পর্কে যা জান লেখ।

খ. উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশন কীভাবে মানুষের নজরে এলো?

গ. উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত? এই এলাকাটির প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পিছনে কী কারণ তা লেখ।

ঘ. ব্রহ্মপুত্র নদ আগে কোথা দিয়ে প্রবাহিত হতো আর এখন কোথায়?

ঙ. কোন কোন নির্দেশন থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের সময়কাল জানা যায়?

ঙ. উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যা ধারণা করেছেন তা বর্ণনা কর।

৪. বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।

ছাপাঞ্জিকত-ছাপ হলো দাগ বা চিহ্ন দেওয়া। কোনো কিছুর ওপর ছাপ দিয়ে অঙ্কন করা।
বাংলাদেশের মুদ্রার ওপর শাপলা ফুল ছাপাঞ্জিকত আছে।

এখানে দুটি শব্দ, ছাপ + অঙ্কিত মিলে হয়েছে ছাপাঞ্জিকত। এই রকম দুই শব্দের মিলন
হলে তাকে বলে সন্ধি। যেমন, নীল + আকাশ= নীলাকাশ।

৫. ঠিক উন্নতিটিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. উয়ারী-বটেশ্বরের প্রাচুর প্রাচীন নির্দশন সংগ্রহ করে জাদুঘরে কে জমা দেন?

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ১. হাসিবুল্লাহ পাঠান | ২. হফিজুল্লাহ পাঠান |
| ৩. হাবিবুল্লাহ পাঠান | ৪. শরিফুল্লাহ পাঠান |

খ. একটি বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে-

- | | |
|--------------|----------------|
| ১. ভাষানটেকে | ২. জানখাঁরটেকে |
| ৩. টেকেরহাটে | ৪. টঙ্গীরটেকে |

গ. কোন নদীপাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস?

- | | |
|---------------|----------------|
| ১. বুড়িগঙ্গা | ২. ব্ৰহ্মপুত্ৰ |
| ৩. শীতলক্ষ্যা | ৪. মেঘনা |

ঘ. ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ বয়ে গেছে কোন অঞ্চলের পাশ দিয়ে?

- | | |
|--------------|-------------|
| ১. মধুপুর | ২. ময়নামতি |
| ৩. পাহাড়পুর | ৪. নরসিংহী |

ঙ. এই সভ্যতা প্রাচীনকালে কী নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল?

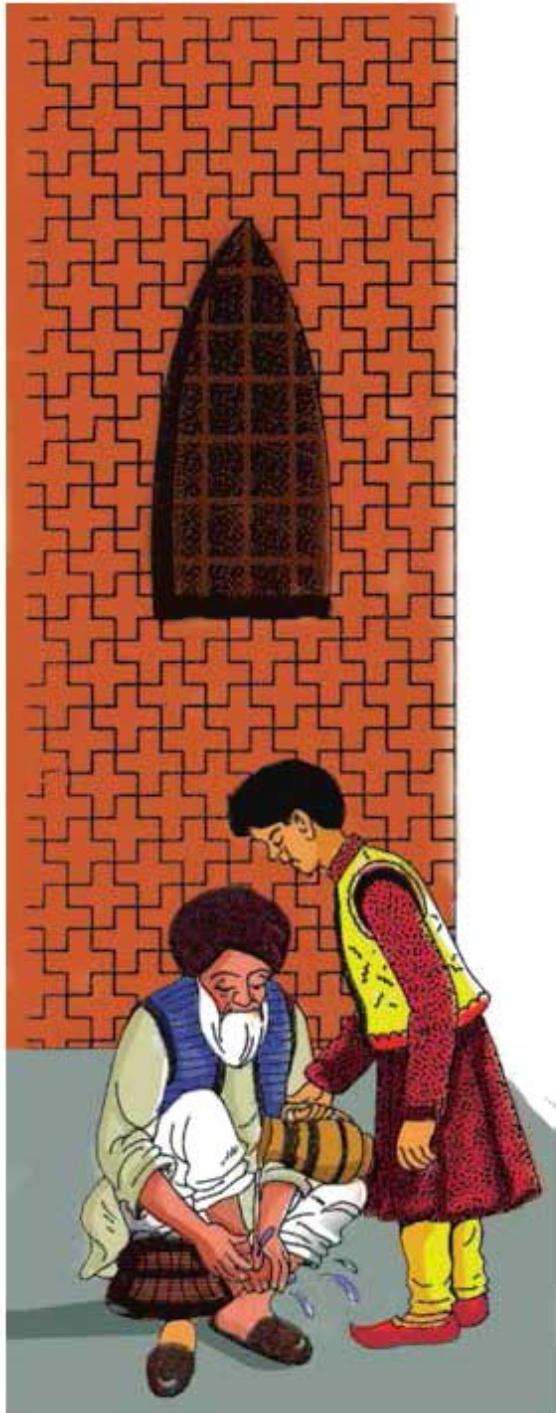
- | | |
|-------------|-------------|
| ১. রূপাগড়া | ২. মনগড়া |
| ৩. সোনাগড়া | ৪. সোনাখুরি |

৬. কর্ম-অনুশীলন।

বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে রচনা লিখি।

শিক্ষাগুরুৰ শৰ্দাদা

কাজী কানেৰ মণ্ডাই



বাদশাহ আলমগীৰ-
কৃষ্ণারে তাহাৰ পড়াইত এক মৌলবি দিল্লিৰ ।
একদা প্ৰভাতে গিয়া
দেখেন বাদশাহ— শাহজাদা এক পাত্ৰ হচ্ছে নিয়া
চালিতেছে বাৰি গুৱুৰ চৰগে
পুলকিত হুদে আনত-নয়নে,
শিক্ষক শুধু নিজ হাত দিয়া নিজেৰি পারেৰ ধূলি
ধূয়ে-মুছে সব কৱিছেন সাফ সঞ্চারি অঙ্গুলি ।

শিক্ষক মৌলবি
ভাৰিলেন, আজি নিষ্ঠাৰ নাহি, ঘাৰ বুৰি তাৰ সবি ।
দিল্লিপতিৰ পুত্ৰেৰ কৰে
লইয়াছে পালি চৰগেৰ পত্ৰে,
স্পৰ্ধাৰ কাজ, হেন অপৰাধ কে কৰেছে— কোন কালে !
ভাৰিতে ভাৰিতে চিতার খেখা দেখা দিল তাৰ ভালে ।

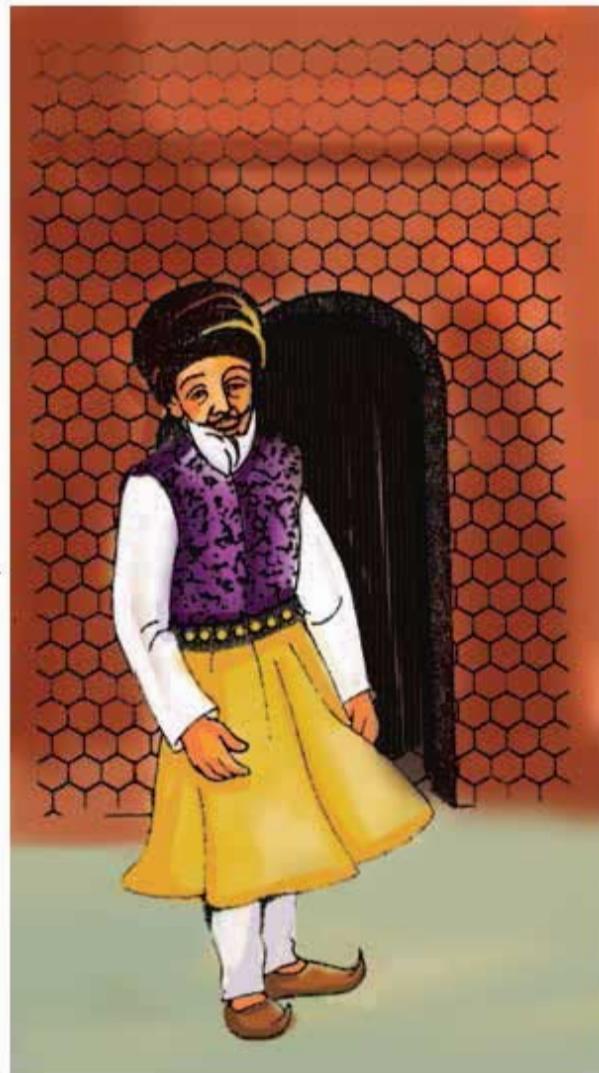
হঠাতে কী ভাৰি উঠি
কহিলেন, আমি ভয় কৱি নাক, ঘাৰ ঘাৰে শিৱ টুটি,
শিক্ষক আমি শ্ৰেষ্ঠ সবাৰ
দিল্লিৰ পতি সে তো কোন ছাই,
ভৱ কৱি নাক, ধাৰি নাক ধাৰ, মনে আছে মোৰ বল,
বাদশাহ শুধালে শান্তেৰ কথা শুনাৰ অনৰ্গতি ।

বায় বাবে প্রাণ তাহে,
প্রাপের চেয়েও মাল বড়, আমি শুনাৰ শাহানশাহে।

তাৰ পৰদিন প্ৰাতে
বাদশাহৰ দৃত শিক্ষকে ডেকে নিয়ে গেল কেলাতে।
খাস কামৱাতে ঘৰে
শিক্ষকে ডাকি বাদশাহ কহেন, 'শুনুন জনাৰ জৰে,
পুত্ৰ আমাৰ আপনাৰ কাছে
লৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে?
বৱং শিখেছে বেৱাদবি আৱ গুৱাজনে অবহেলা,
নহিলে দেদিন দেখিলাম যাহা বযং সকাল বেলা।'

শিক্ষকে কল— 'জাহাগনা, আমি বুঝিতে পাৰি নি, হায়,
কী কথা বলিতে আজিকে আমাৰ ডেকেছেন নিৱালাই?'
বাদশাহ কহেন, 'সে দিন প্ৰাতে
দেখিলাম আমি দাঁড়াৱে তফাতে
নিজ হাতে ঘৰে চৱণ আপনি কৱেন প্ৰকালন,
পুত্ৰ আমাৰ জল চালি শুধু ভিজাইছে ও চৱণ।
নিজ হাতখানি আপনাৰ পায়ে বুলাইয়া সঘতনে
ধুৱে দিল নাক কেল সে চৱণ, বড় ব্যথা পাই অনে।'

উচ্ছ্঵াস ভৱি শিক্ষকে আজি দাঁড়াৱে সগৌৱে,
কুৰ্ণিশ কৰি বাদশাহে ভৰে কহেন উচ্চৱৰে—
'আজ হতে চিৰ উন্নত হলো শিক্ষাগুৱৰ শিৱ
সভ্যই তুমি মহান উদাৰ বাদশাহ আলমগীৱ।'



অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

‘শিক্ষাগুরুর মর্যাদা’ কবিতায় শিক্ষকের মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কবিতায় শিক্ষক একজন সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বাদশাহ আলমগীরের ছেলের দ্বারা পায়ে পানি ঢেলে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাদশাহ আলমগীর এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। বাদশাহ আলমগীর প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁর সন্তান পানি ঢেলে নিজ হাতে শিক্ষকের পা ধূয়ে দেবেন। তবেই না তাঁর সন্তান নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম নিয়ে দেশের একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। বাদশাহ আলমগীর উপলব্ধি করেছিলেন, যে ছাত্র তাঁর শিক্ষককে যথাযথ মর্যাদা দিতে জানে না, শিক্ষকের সেবা করতে জানে না, সে কখনো পরিবার, সমাজ ও দেশের উপযোগী মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না।

শিক্ষাগুরুর মর্যাদা কবিতার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, শিক্ষা হলো একটি জাতির মেরুদণ্ড, আর শিক্ষক হলেন কাঞ্চারি। তিল তিল করে নীরবে নিভৃতে শিক্ষক তাঁর আদর্শ দ্বারা জাতীয় আকাঙ্ক্ষার উপযোগী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলেন। সমাজ ও দেশের জন্য শিক্ষকের অবদান অপরিসীম। তাই সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা সবার উপরে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কুমার শাহজাদা বারি চরণ শির শাহানশাহ প্রকালন কুর্ণিশ

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কুমার	বারি	চরণ	শির	শাহানশাহ	কুর্ণিশ
-------	------	-----	-----	----------	---------

- ক. পিতার হাত রেখে পুত্র দোয়া চাইল।
- খ. বর্ষাকালে প্রবল বর্ষণ হয়।
- গ. আগের দিনে হাতি—ঘোড়া চড়ে শিকারে যেতেন।
- ঘ. উজির বাদশাহকে করলেন।
- ঙ. আলমগীর ছিলেন একজন মহৎপ্রাণ শাসক।
- চ. অন্যায়ের কাছে কখনো নত করব না।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

- ক. বাদশাহ আলমগীরের পুত্রকে কে পড়াতেন?
- খ. একদিন সকালে বাদশাহ কী দেখতে পেলেন?
- গ. বাদশাহকে দেখে শিক্ষক প্রথমে কী ভাবলেন?
- ঘ. ‘প্রাণের চেয়েও মান বড়’— শিক্ষক এ কথা বললেন কেন?

- ঙ. বাদশাহ আলমগীর শিক্ষককে প্রথমে কী বললেন?
 চ. শিক্ষক কী বলে বাদশাহর সুনাম করলেন?

৫. নিচের কথাগুলো কুবে নিই।

শিক্ষকে ডাকি বাদশাহ কহেন, ‘শুনুন জনাব তবে,

পুত্র আমার আপনার কাছে

সৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে?

বরং শিখেছে বেয়াদবি আর গুরুজনে অবহেলা,

নহিলে সেদিন দেখিলাম বাহা ঘরাএ সকাল বেলা।’

৬. ক, ব, ম, ঝ— প্রজেকটি বৃক্ষবর্ণ ব্যবহার করে ডিস্টি করে শব্দ শিখ। যেমন—

$$\text{ক} = \text{ক} + \text{ব} \quad — \quad \text{কব}, \text{শিক্ষা}, \text{সক্ষম}$$

$$\text{ব} = \text{স} + \text{ব} \quad —$$

$$\text{ম} = \text{স} + \text{ম} \quad —$$

$$\text{ঝ} = \text{স} + \text{ত} + \text{ব} \quad —$$

৭. বিশ্লেষণগুলো টিকিয়তো সাজাই।

বড়	অপযশ
-----	------

মান	অবলত
-----	------

যশ	বিকাল
----	-------

বিশ্বাদ	অপমান
---------	-------

উন্নত	ছেট
-------	-----

সকাল	হৰ্ষ
------	------

কবি-পরিচিতি

কবি কাজী কামের মওলান ১৯০৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি পাঁচদিনজ্যোতির
 মুর্শিদাবাদ জেলার আলিবপুর প্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা
 বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনৱার্ত্ত অনুর্বার্ত ও বিটি পাশ করেন। তিনি
 চাকরি জীবনের প্রথমে ছিলেন সাব ইলেক্ট্রিচ, পরে বিভিন্ন কূলে প্রায়শ
 শিক্ষকের সামিক্ষ পাস করেন। তিনি সৈতিকাণ্ডা ও কাহিনিভূলক লিখনের
 কাবিতার জন্য দ্যাতি লাভ করেন। ১৯৮৩ সালের ওরা জানুয়ারি তিনি
 মৃত্যুবরণ করেন।



কাজী কামের
মওলান

ଭାବୁକ ଛେଲୋଟି

ଦଳ-ଏଗ୍ରୋ ବହରେର ଛେଲୋଟି ତେମନ ଦୂରତ୍ୱ ନଥ । ପଡ଼ାଶୋନାରେ ତାଳୋ, ଖେଳାଖୁଳାଓ କରେ । ତବେ ସମୟ ପେଲେଇ ଗାଛ-ଗାଛଳି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେ । ବ୍ରୋଦ-ବ୍ରୁଟିର ବ୍ୟାପାରଟାଓ ଦେଖେ ସେ । ଆକାଶେ ମେଘ ଡାକେ । ବିଦ୍ୟୁତ ଚମକାୟ । ବାଜ ପଡ଼େ । କେବ ଏମନ ହୁଁ ? ଅବାକ ବିଦ୍ୟରେ ଭାବେ ସେ । ବଢ଼େ ଗାହପାଳା ଡେଲେ ପେଲେ ବାବାକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ।

— ଆଜ୍ଞା ବାବା, ଗାଛ ଡେଲେ ପେଲେ, ଖଦେଇକେ କାଟିଲେ ବ୍ୟଥା ପାଇଁ ନା ?
ଛେଲେର କଥା ଶୁଣେ ମା ହାସେନ । ବାବା କିମ୍ବୁ ହାସଲେଓ ଛେଲେର ଥିଲେଇ ଜ୍ଵାବ ଦେଉଯାର ଚେଷ୍ଟା କରେନ ।
ଓର ବାବା ମ୍ୟାଜିସ୍ଟ୍ରେଟ ଛିଲେନ । ଆପେ କୁଳେ ଶିକ୍ଷକତା କରେହେଲ ।

ଛେଲୋଟିର ବାବାର ବାଢ଼ି ବିକ୍ରମପୁରେର ମାଟିଖାଲ ଥାଏ । ତବେ ତାର ଜନ୍ମ ମଯମନସିହେ । ୧୮୫୮ ମାର୍ଗେ ତ୍ରିଶେ ନତେମ୍ବର । ଓର ପଡ଼ାଶୋନାଯି ହାତେଖଢ଼ି ହରେଇଲ ବାଢ଼ିତେଇ । ତାରପର ମଯମନସିହେ କୁଳ ଶିକ୍ଷାର ଧାପ ଶେବ କରେ ସେ ଉତ୍ତି ହୁଁ କଳକାତାଯ । ଲେଟ ଜେତିଆର୍ସ କୁଳ ଥେବେ ୧୮୭୪ ମାର୍ଗେ କୃତିତ୍ତେର ସଜ୍ଜେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାସ କରେ । କୃତିତ୍ତେର ଧାରାଯି ମେ ୧୮୭୮ ମାର୍ଗେ ଏଫ୍‌ଏ ପାସ କରେ । ତାରପର ୧୮୮୦ ମାର୍ଗେ ବିଜ୍ଞାନ ଶାଖାର ବିଏସ ପାସ କରେ ବିଲେତେ ଯାଇ ଭାଙ୍ଗାରି ପଡ଼ିଲେ ।

ମେଇ ଛେଲୋଟିଇ ବଡ଼ ହରେ ପ୍ରଥମ ବାଙ୍ଗଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୋଡ଼ା ଧ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରେ । ତୋମରା ଅନେକେଇ ହରତୋ ବୁଝାତେ ପେନୋଇ କେ ତିନି । ହୁଁ, ମେଦିନିକାର ମେଇ ଭାବୁକ ଛେଲୋଟିଇ ପରବତୀକାଳେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜଗନ୍ନାଥଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ।





জগদীশচন্দ্র এক বছর ডাক্তানি পড়ার পর ১৮৮১ সালে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘান। এখান থেকে উচ্চশিক্ষা সার্ভ করেন তিনি। ১৮৮৫ সালে দেশে ফিরে এসে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে ঘোষ দেন। তখন দেশ ছিল প্রাথীন। এ সময় একই পদে একজন ইংরেজ অধ্যাপক যে বেতন পেতেন তারভীয়রা পেতেন তার তিন ভাসের দুই ভাগ। জগদীশচন্দ্র অস্থায়ীভাবে চাকরি করছিলেন বলে তাঁর বেতন আরও এক ভাগ কেটে নেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে কর্তব্য পালন করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। সকল বকেয়া পরিশোধ করে চাকরিতে স্থায়ী করে তাঁকে। তখন থেকেই তিনি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু হয়ে উঠেন। সভন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে।

জগদীশচন্দ্র বসু নানা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তবে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন গাছেরও প্রাণ আছে—এই সত্য প্রমাণ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, উক্তি ও প্রাণীর জীবনের মধ্যে অনেক মিল আছে। ১৮৯৫ সালে তিনি অতিক্রম তরঙ্গস্ফূর্তি আবিষ্কার করেন। কোনো তার ছাড়া তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণে সফলতা অর্জন করেন। তাই প্রয়োগ ঘটেছে আজকের বেতার, টেলিভিশন, রাডারসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান-প্রদান এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে।

মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে করা পরীক্ষণগুলো ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চমকে দেয়। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন বিলেতেই অধ্যাপনা করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন।



জগদীশচন্দ্র বসু

তাঁর আচর্য সব আবিষ্কার দেখে সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন: জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ।

জগদীশচন্দ্র বাংলাতেও বেশ লিখেছেন, বিশেষ করে তোমাদের মতো শিশুদের জন্য। তাঁর লেখা ‘নিরুদ্ধেশের কাহিনী’ বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। এটি পরে ‘পলাতক তুফান’ নামে জগদীশচন্দ্রের ‘অব্যক্ত’ নামক বইয়ে ছাপা হয়। তাঁর লেখা ‘অদৃশ্য আলোক তোমাদের আনন্দ দেবে।

১৯১৫ সালে ব্রিটিশ-ভারত সরকার তাঁকে ‘নাইট উপাধি’ দেন। তাই তাঁর উপাধিসহ নাম হয় স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। ১৯১৬ সালে তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর দুই বছর পর প্রতিষ্ঠা করেন জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দির। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেই বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা পরিচালনা করেন। বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতা বিজ্ঞানী গ্যালিলি-নিউটনের সমকক্ষ ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে ১৯৩৫ সালে। জগদীশচন্দ্র বসু ভারতের গিরিডিতে মাঝে যান ১৯৩৭ সালের তেইশে নতুন পথে।

ওই সময়ের সেই ভাবুক ছেলেটিই স্যার জগদীশচন্দ্র বসু একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি বাঙালির গৌরব। সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। পৃথিবীকে দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের নতুন পথ।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

পর্যবেক্ষণ পার্টিয়পূর্ণ বিজয়স্তম্ভ গিরিডি কল্পকাহিনি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি
প্রবেশিকা এফএ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বিজয়স্তম্ভ কল্পকাহিনি আবিষ্কার কল্যাণ পার্টিয়পূর্ণ দুরন্ত পদার্থে

পদার্থবিজ্ঞানের বিশ্যে বাড়িতে অতিক্ষুদ্র কর্তব্য প্রাণী জীবনের

ক. তাঁর বক্তৃতা শুনে তাঁকে অধ্যাপনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

খ. দেশের করার জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন।

গ. জগদীশচন্দ্র বসুর আশ্চর্য সব দেখে আইনস্টাইন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

ঘ. জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি।

ঙ. জগদীশচন্দ্র বসুর ‘নিরুদ্দেশের কাহিনি’ বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বৈজ্ঞানিক।

চ. ছেলেটি তেমন নয়।

ছ. মেঘ ডেকে আকাশে বিদ্যুৎ চমকে বাজ পড়লে অবাক ভাবে।

জ. ওর পড়াশোনার শুরু।

ঝ. প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক পদে যোগ দেন।

ঞ. প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে পালন করেন।

ট. তিনি দেখিয়েছিলেন যে, উষ্ণিদ ও মধ্যে অনেক মিল আছে।

ঠ. তিনি তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন।

৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

- শিক্ষার ধাপ পার - প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়—এর শিক্ষা হলো একটার পর একটা শিক্ষার ধাপ।
- বকেয়া পরিশোধ - কারো নিকট কোনো টাকা-পয়সা পাওনা থাকলে যদি সময়মতো দেওয়া না হয় তখন তা বকেয়া হয়ে যায়। পরে যদি আগের পাওনা দিয়ে দেওয়া হয় তবে তাকে বলে বকেয়া পরিশোধ।
- অন্যতম - বহুর মধ্যে এক হলে তাকে বলা হয় অন্যতম। কোনো কিছুকে বিশেষভাবে বোঝানোর জন্য ‘অন্যতম’ শব্দটি ব্যবহার করা যায়।
- তথ্যের আদান-প্রদান - তথ্য বলতে ঠিক সংবাদ, প্রকৃত অবস্থা বা সত্যকে বোঝাতো। কিন্তু আজকের দিনে লিখে, ছাপিয়ে অথবা বেতার, টেলিভিশন, ফোন, ইন্টারনেটের সাহায্যে যত রকম কিছু পাওয়া যায়, পাঠানো যায় তার সবই তথ্যের আদান-প্রদান।
- নাইট উপাধি - নাইট উপাধি ব্রিটিশরাজের অত্যন্ত সম্মানজনক উপাধি। এঁদেরকে ‘স্যার’ বলে সম্মৌখন করা হয়।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

‘বিজ্ঞান শিক্ষাই সভ্যতা বিনির্মাণের একমাত্র হাতিয়ার’ – বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।

৭. আমার জানা যেকোনো একজন বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে ২০টি বাক্য লিখি।

দুই তীরে

মনি মনা খঁটুন

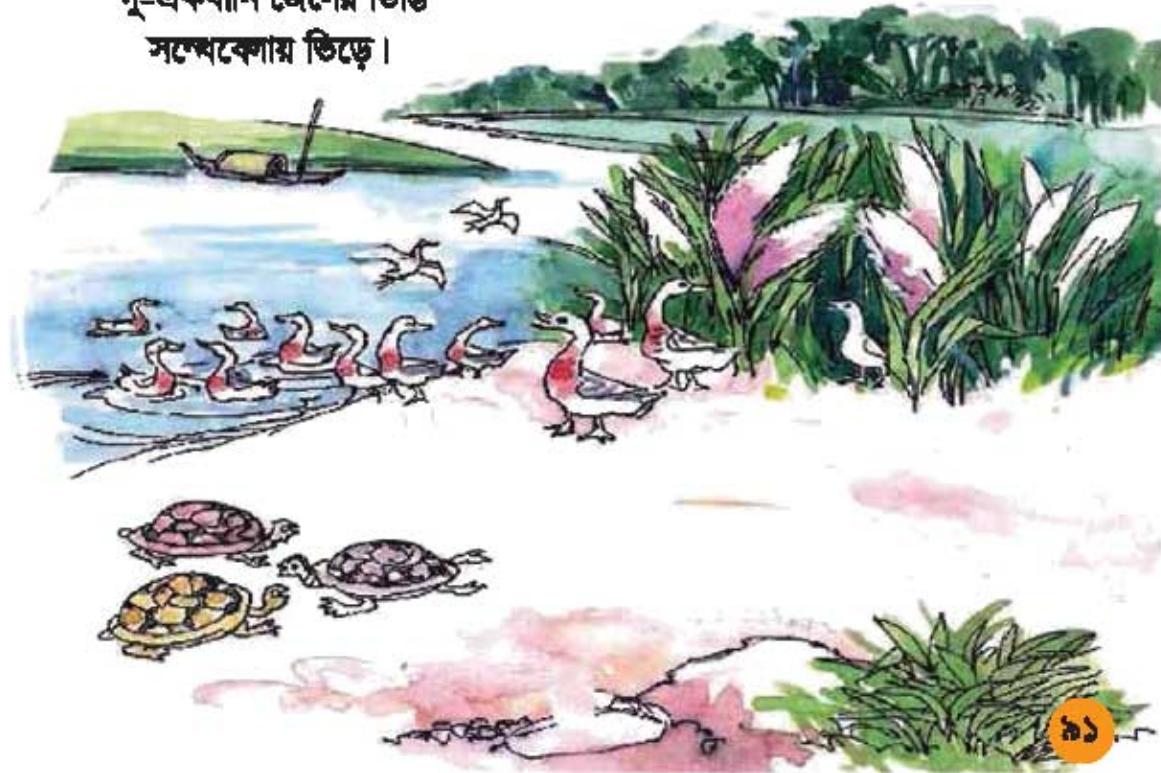
আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জনে
চকাচকির ঘর।

যেখায় ফুটে কাশ
ভট্টের চারি পাশ,
শীতের দিনে বিদেশি সব
হাসের বসবাস।

কচ্ছপেরা ধীরে
ঝৌড় পোহায় তীরে,
দু-একখানি জেলের ডিঙি
সলৈকেলায় ডিঢ়ে।

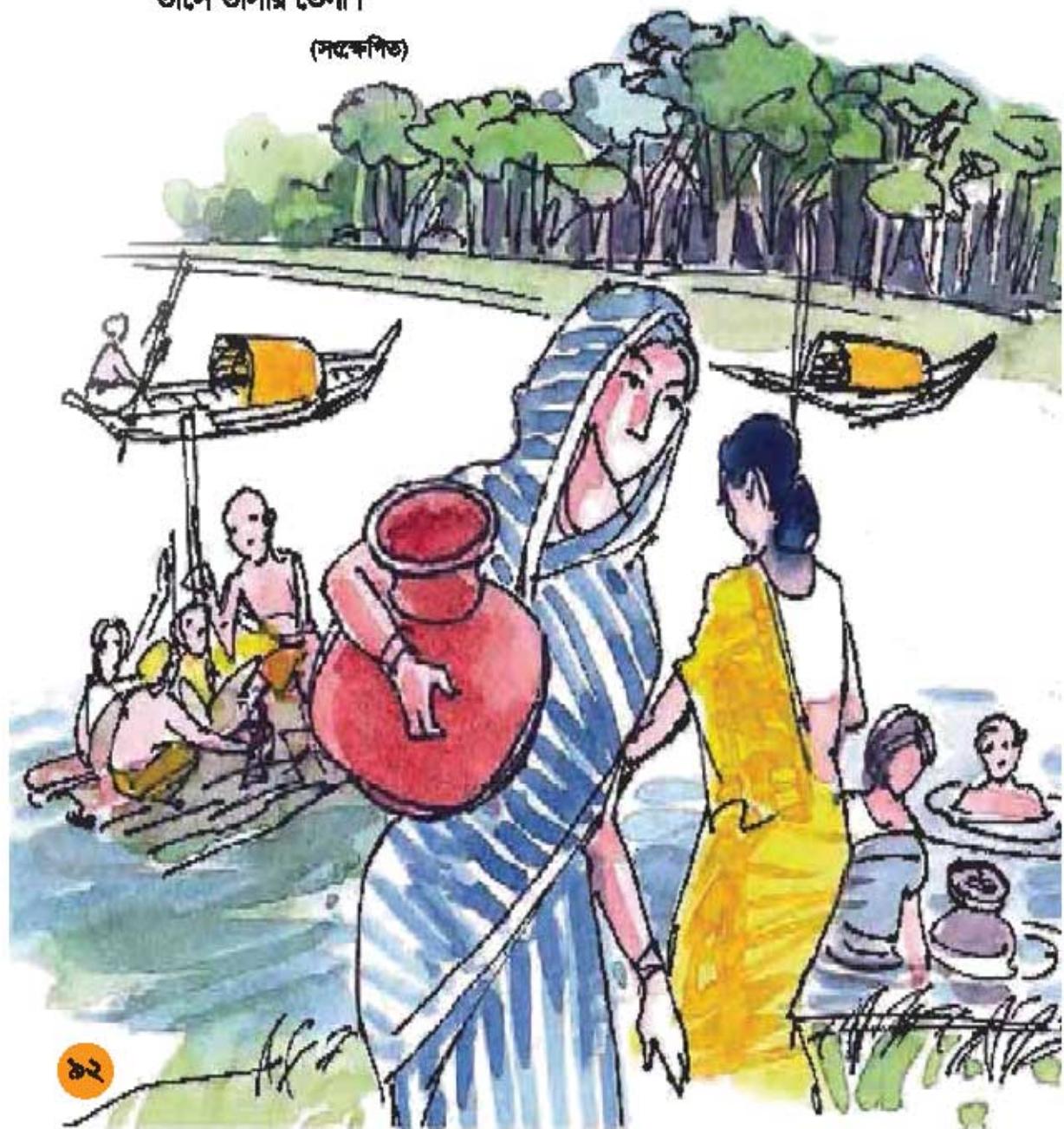
ভূমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেখায় গৌথা ঘনজ্বায়া
গাতার আচ্ছাদন।

যেখায় বীকা গলি
নদীতে ঘাস চলি,
দুই ধারে তার বেশুবনের
শাখায় পলাগলি।



সকাল-সন্ধিবেলা
ঘাটে বধূর মেলা
হেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে ভাসাই ভেলা।

(সংকলিত)



অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

একটি নদী, তার দুই তীঁত্রে দু-জন মানুষ বাস করে। একজন ভালোবাসে তার নদীর বালুচর, শরৎকালে চকচকিয়া খেখানে ঘর থাঁথে। এর তীঁত্রে তীরে ঝুটে থাকে কাশকূল। শীতের সময় হাসেরা এসে তিড় করে, কচ্ছপ তোদ পোহায়। সম্ম্যায় জেলের ডিঙি এসে তেড়ে। অন্যজন ভালোবাসে বন, ঘার আছে ঘন ছায়া। সেখান থেকে একটা রাস্তা এসে ঘিঞ্চে নদীতে। নদীর ঘাটে বধুরা আসে, ছেলেরা জলে জেলা ভাসায়। একটি নদী দুই তীঁত্রের মানুষকে কী সুন্দর মিলিয়ে দিয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে শুনে কের করি। অর্থ বলি।

নির্জন চকচকি তট ডিঙি আচ্ছাদন বেণুবন

৩. যেনের শিখের শব্দগুলো আগি আগ্রাম বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

চকচকিয়া আচ্ছাদন তটে বেণুবন নির্জন ডিঙি

ক. এলাকাটি এত যে গা ছমছম করে।

খ. নদীর ধারে দল বৈধে উড়ে বেড়ায়।

গ. প্রামের ছোট ছোট নদীগুলো দিয়ে মানুষ করে নদী পারাপার হয়।

ঘ. নদীর তীরে বটগাছটি বর্ষাকালে মানুষ অতিবহন্ত মেলা বসে।

ঙ. নদীর তীরে বটগাছটি বর্ষাকালে মানুষ হিসাবে ব্যবহার করে।

চ. নদীর ধারে গজিয়ে ওঠা বাতাসে দুলতে থাকে।

৪. নিচের কবালুকো বুবে নিই।

ভূমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
বেধায় শীঁধা ঘনজ্বায়া
বাতার আচ্ছাদন।



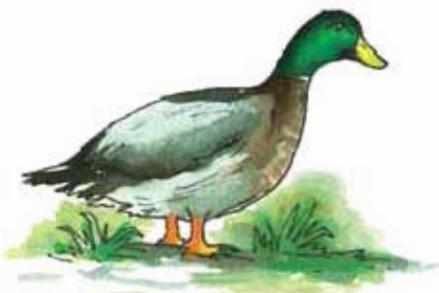
৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও শিখি।

- নদীর বালুচরে কী ঘটে?
- দুই তীব্রে দু-জন মানুষের ভালো লাগার জিনিসগুলো কী?
- আটে বধূর মেলা কলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- দুই তীব্রে কবিতায় ওই পাঞ্জের বনটি কেমন?
- সকাল-সন্ধেবেলা ছেলের দল কী করে?

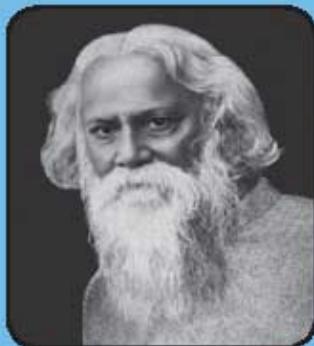
৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

শূন্যস্থানে কথা বসিলে একটি কবিতা বা ছড়া শেখার চেষ্টা করি।



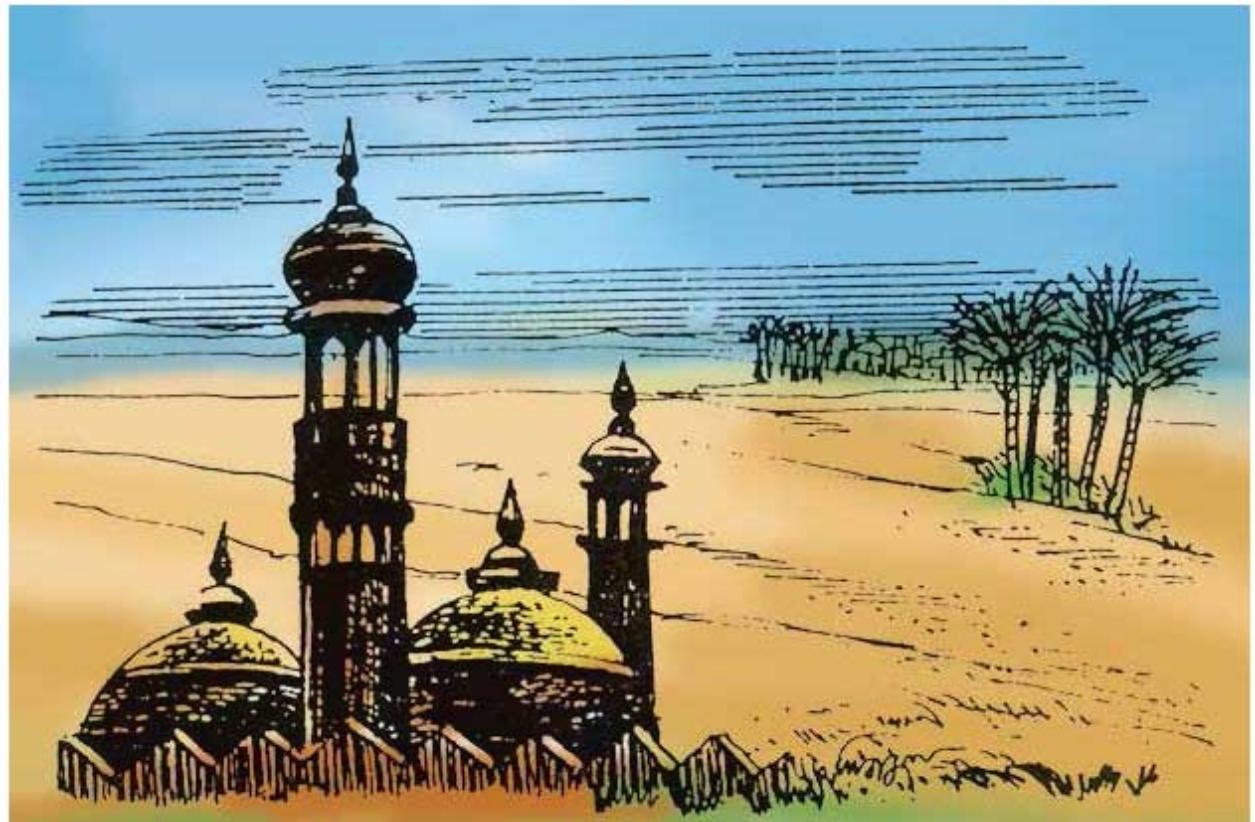
..... যাস,
..... বীণ।
..... চর,
..... ঘর।
..... ঘন,
..... বন।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-পরিচিতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বালা সনের ২৫শে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শূধু কবি নন, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, দার্শনিক, গীতিকার, সুরক্ষিতা, চিত্রশিল্পী, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। তাঁর রচনাভাঙ্গ বিশাল। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট, ১৩৪৮ বালা সনের ২২শে খাবণ, তিনি মৃত্যুবরণ করেন।



বিদায় হজ

দশম হিজরি। আরবদেশের অনেকেই তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন সত্য, ন্যায় ও মানবতার বাণী। ইসলামের এ বাণী তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

দশম হিজরির হজের সময় এসে গেল। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) অভরের গভীরে কাবার আহ্মান অনুভব করলেন। তিনি স্থির করলেন সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে হজ পালন করবেন। এই সংবাদ চারদিকে দৃঢ় ছড়িয়ে পড়ল।

ফিলকাদ মাস। নবিজির (স) কাছে সমবেত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। তাঁদের ইচ্ছা নবিজির (স) সঙ্গে হজ পালন করবেন। ফিলকাদ মাসের শেষ দিকে মহানবির (স) সঙ্গে তাঁরা মক্কার পথে যাত্রা করলেন। যাত্রা তাঁকে কখনও দেখেন নি তাঁরাও এই মহামানবকে এক বার দেখার জন্য কাবালিকে এলেন।

আরব দেশের নানা স্থান থেকে সেবার প্রায় দুই লক্ষ মানুষ হজ পালন করতে আসেন। আরাফাতের ময়দানে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে মহানবির (স) মন আনন্দে ভরে গেল। এত মানুষ! এরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। জাবালে রাহমাত নামক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। হজ উপলক্ষে আরাফাত ময়দানে নবিজির (স) এটিই শেষ ভাষণ। আর তাই এটি বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত। মানবজাতি চিরদিন তাঁর এই ভাষণকে গভীর শৃঙ্খায় ঝরণ করবে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর সমবেত মানুষের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন:

তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। আজকের এই দিন তোমাদের কাছে পবিত্র। এ মাসটিও তেমনি তোমাদের কাছে পবিত্র। তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি তোমাদের পরম্পরের কাছে পবিত্র।

মনে রেখ, একদিন তোমরা আল্লাহর কাছে হাজির হবে। পৃথিবীতে তোমরা যে কাজ করেছ, আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব চাইবেন।

তোমাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরাও আল্লাহর বান্দা। তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার কর না। তোমরা নিজেরা যা খাবে, তাদেরও তাই খেতে দেবে। নিজেরা যে কাপড় পরবে, তাদেরও তাই পরতে দেবে।

কোনো ক্রীতদাস যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে। তখন বংশ-মর্যাদার কথা বলবে না।

মনে রেখ, সব মুসলমান একে অন্যের ভাই। তোমরা এক ভাই কখনও অন্য ভাইয়ের সম্পত্তি জোর করে দখল কর না।

কখনও অন্যায় এবং অবিচার কর না। সামান্য পাপ থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

আজ যারা এখানে আসে নি, আমার উপদেশ তাদের কাছে পৌঁছে দিও। হয়ত এই উপদেশ তারা বেশি করে মনে রাখবে।

মানুষ নিজের কাজের জন্য নিজেই দায়ী থাকবে। একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করা চলবে না।

মহানবি জোর দিয়ে বললেন :

ধর্ম নিয়ে বাড়াবাঢ়ি করবে না। নিজের ধর্ম পালন করবে। যারা অন্য ধর্ম পালন করে, তাদের ওপর তোমরা ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কর না।

মহানবি (স) চারটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বললেন। এই চারটি কথা হলো :

- আশ্রাহ ছাড়া অন্য কারণ উপাসনা কর না।
- অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা কর না।
- পরের সম্পদ অপহরণ কর না।
- কারণ ওপর অভ্যাচার কর না।

মহানবি হ্যন্ত মুহাম্মদ (স) আরও বললেন :

তোমাদের কাছে আমি দুটি জিনিস ক্ষেত্রে যাচ্ছি।

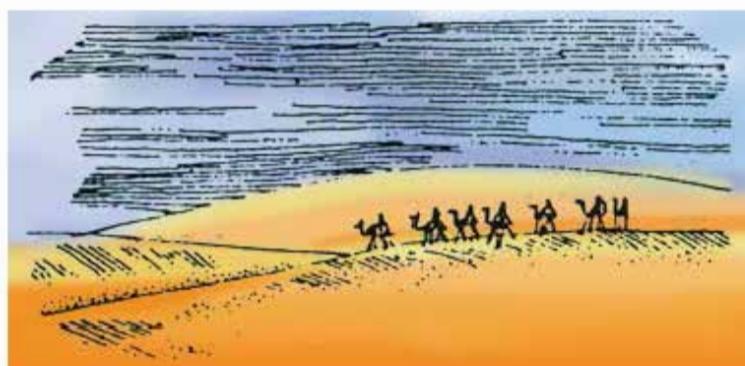
এক. আশ্রাহর বাণী অর্থাৎ কুরআন।

দুই. আশ্রাহর প্রেরিত পুরুষ মাসুলের জীবনের আদর্শ। এই দুটি তোমাদের পথ দেখাবে।

মহানবি (স) তার ভাষণ শেষ করলেন। তাঁর চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “হে আশ্রাহ, আমি কি তোমার বাণী মানুষের কাছে পৌতে দিতে পেরেছি?”

আরাফাতের ময়দান থেকে লক্ষ লক্ষ কর্তৃ ধনিত হল, “হ্যা, আপনি পেরেছেন।”

মহানবি হ্যন্ত মুহাম্মদ (স)- এর মন তখন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। পৃথিবীতে তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। তাঁর মনে হলো, হ্যন্ত এটাই তাঁর জীবনের শেষ হজ। হ্যন্ত তিনি আর কাবাশরিকে উপস্থিত হতে পারবেন না। সমবেত মানুষের উদ্দেশে তিনি বললেন, “তোমরা সাক্ষী, আমি কর্তব্য পালন করেছি। বিদায়।”



अनुशीलनी

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।
হিজরি হজ মহানবি কাবাশরিফ আরাফাত ভাষণ বান্দা আমির
উপাসনা ক্রীতদাস যিলকাদ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আরাফাত **ক্রীতদাস** **কাবাশরিফ** **মহানবি** **হিজরি** **হজ**

- ক. দশম হজের সময় এসে গোল।
খ. তাঁদের ইচ্ছা নবিজির (স) সঙ্গে পালন করবেন।
গ. হ্যরত মুহাম্মদ (স) প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করলেন।
ঘ. যাঁরা তাঁকে কখনও দেখেন নি তাঁরাও এই মহামানবকে একবার দেখার জন্য
এলেন।
ঙ. ময়দান থেকে লক্ষ লক্ষ কঠ্টি ধ্বনিত হল, ‘হ্যা, আপনি পেরেছেন।’
চ. কোনো যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে।

- ### ৩. প্রশ়ঙ্গলোর উক্তর বলি ও লিখি।

- ক. হিজরি কোন সালে বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়?

খ. আরাফাত-ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখে নবিজির (স) মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল?

গ. মহানবি (স) তাঁর ভাষণে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী সম্পর্কে কী বলেছেন?

ঘ. ধর্ম সম্পর্কে মহানবি (স) কী উপদেশ দিয়েছেন?

ঙ. কোন চারটি কথা নবিজি (স) বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছেন?

চ. তিনি আমাদের কাছে কোন দুইটি জিনিস রেখে গেছেন?

৪. ঠিক উভয়টিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিই।

- ক. বিদায় হজ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

 ১. মদিনায়
 ২. মক্কায়
 ৩. আরাফাতের ময়দানে
 ৪. জেদ্বায়

- খ. আরাফাতের ময়দানে কত লক্ষ মানুষ হজ পালন করতে আসেন?
১. প্রায় এক লক্ষ
 ২. প্রায় দুই লক্ষ
 ৩. প্রায় তিন লক্ষ
 ৪. প্রায় চার লক্ষ
- গ. হ্যরত মুহাম্মদ (স) কাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে নিষেধ করেছেন?
১. সৈন্যদের
 ২. সাহাবিদের
 ৩. আলেমদের
 ৪. ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের
- ঘ. মহানবি (স) কয়টি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বললেন?
১. দুইটি
 ২. চারটি
 ৩. ছয়টি
 ৪. আটটি
- ঙ. মহানবির (স) ঢোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কেন?
১. মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দেওয়ার জন্য
 ২. মক্কা জয়ের আনন্দে
 ৩. সাহাবিদের নিয়ে হজ পালন করতে পারায়
 ৪. বিদায় হজের ভাষণে বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে

৫. নিচের বাক্যগুলো এককথায় প্রকাশ করি।

- | | | |
|-----------------------|---|-------------|
| যার তুলনা হয় না | — | অতুলনীয় |
| যার শত্রু জন্মায় নি | — | অজ্ঞাতশত্রু |
| আকাশে যে উড়ে বেড়ায় | — | খেচর |
| বিদেশে থাকে যে | — | প্রবাসী |
| যা কষ্টে লাভ করা যায় | — | দুর্লভ |
| যা জলে চরে | — | জলচর |

৬. বিরামচিহ্নগুলো চিনে নিই।

বিরামচিহ্নের নাম	চিহ্নের আকৃতি
কমা	,
সেমিকোলন	;
দাঁড়ি	
জিজ্ঞাসা-চিহ্ন	?
বিশ্বয়-চিহ্ন	!

বাক্যের অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা শেষে আমরা বিরামচিহ্ন ব্যবহার করি। নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যও এই চিহ্নের জায়গায় আমরা থামি।

এবার নিচের বাক্যগুলো পড়ি এবং ঠিক জায়গায় বিরামচিহ্ন বসাই :

এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে নবিজির (স) মন আনন্দে ভরে গেল এত মানুষ এরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে তাঁর মনে হলো হয়ত এটাই তাঁর জীবনের শেষ হজ।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

‘বিদায় হজ’ রচনাটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো লিখ।

ଦେଖେ ଏଣ୍ଟାମ ନାୟାଆ

ତୋମରା ନିଚକୁଇ ଜଳପ୍ରଗାତେର କଥା ଶୁନେହଁ । ଜଳପ୍ରଗାତ ଦେଖାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏକବାର ଆମାର ହେଲାଛି । ନିଜେର ଦେଶେ ନୟ, ବିଦେଶେର ମାଟିତେ । କାନାଡାଯି ଗିଯୋହି । ଦେଖାଲକାରୀ ଖୁବ ବଡ଼ ଶହର ଟାରଟୋଟାତେ । ଏକଦିନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଦେର ସଙ୍ଗେ ଗଞ୍ଜେର ମଜ଼ଗିସେ କଥା ଉଠିଲୁ—ସବାଇ ମିଳେ ନାୟାଆ ଦେଖତେ ଗୋଲେ କେମନ ହୟ । ତଥାନି ସକଳେ ରାଜି । କୋନମିଳିଲ ଯାଉଯା ହବେ ତାଓ ଠିକ ହଲୋ ।

କୋଥାଓ ଯାବ ବଲାଇ ତୋ ହୟ ନା, କୀତାବେ ଯାବ ତା ଭାବତେ ହୟ । ବାସେ କରେ ଯାଉଯା ଯାଯା । କିନ୍ତୁ ବାସେ ଚେପେ ଗୋଲେ ନିଜେର ଇତ୍ତେମତୋ ବେଖାନେ ଦେଖାନେ ଥାମା ଯାଯା ନା । ଅତଏବ ଠିକ ହଲୋ ଯେ, କୋନୋ ବନ୍ଧୁର ଏକଟା ଗାଡ଼ି ନିଯେ ଯାଉଯା ହବେ ।



ତାଇ ଯାଉଯା ଗୋଲ ଏକଦିନ । ଆମେରିକାର କିଂବା କାନାଡାଯି ଥାଇ ସକଳେଇ ନିଜେର ଗାଡ଼ି ଥାକେ । ଆମାର ବନ୍ଧୁରାଓ ଛିଲ । ବନ୍ଧୁରାଇ ଏକ ବିଶାଳ ଗାଡ଼ିତେ ଏକଦିନ ଚଢ଼େ ବସନ୍ତାମ । ଚଲୋ ନାୟାଆ, ଚଲୋ ନାୟାଆ । ଆହ୍, ଦେଶେ ଫିତ୍ରେ ଗିଯେ କୀ ଗର୍ବଟାଇ ନା କରା ଯାବେ ।

শী শী করে গাড়ি ছুটতে লাগল। এখানে রাস্তা মোটেই আঁকাবাঁকা থাকে না, রেললাইনের মতো সোজা। ফলে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব হয়।



কিন্তু এত জায়গা থাকতে নায়ারা দেখতেই যেতে হবে কেন? নায়ারা হলো জলপ্রপাত। জলপ্রপাত তো কখনো দেখি নি। শুধু জেনে এসেছি, ঝর্ণার মতো পাহাড়ের উপর থেকে পানি নিচে সমতল ভূমিতে গাঢ়িয়ে পড়ে। তবে আকারে অনেক বিশাল। ঝর্ণা ছোট, আর জলপ্রপাত বড়— এটুকু যা তফাত। উপর থেকে নিচে জল পতনের ব্যাপার দুইজায়গাতেই ঘটছে। জল যদি না-ই পড়ে, তা হলে ঝর্ণাও হবে না, জলপ্রপাতও হবে না। কিন্তু জল যে নিচে পড়ছে, পড়ে বাছেটা কেখায়? জলের ধর্ম তো গড়িয়ে যাওয়া। ঝর্ণার জলও গড়াতে ক্রমশ নদী হয়ে যায়।

এখন অন্য কথায় আসি। জলপ্রপাত দেখতে যাব, কিন্তু পাহাড় দেখব না— একি কখনো সম্ভব? সম্ভব নয়। কারণ পাহাড় বেঁচে জলের নিচে নামাটা না দেখে উপার তো নেই।

কিন্তু বিশ্ব-ভূমঙ্গল বড়ই বিচ্ছিন্ন! কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে! পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রামে। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামে নি।

সমতলের ওপর দিয়ে একটি খরস্নোতা নদী বইছে। সামনের সবকিছু তো ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কই? কিছুই তো ভাসছে না! তার কারণ, যে মাটির ওপর দিয়ে এই খরস্নোতা নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে হঠাতে করেই এক বিশাল ফাটল। দুই দিকের মাটির মধ্যে এক বিরাট ফাঁক। একটা নদী যতখানি চওড়া হতে পারে ততখানি ফাঁক। নায়াগ্রাম জল ঐ ফাঁকের ভিতরে চলে যাচ্ছে। এটাও তো প্রগতি, কারণ পানি পড়ছে। তবে, সাধারণ জলপ্রপাতের মতো পাহাড় থেকে নিচে পড়ছে না। পড়ছে, সমতল থেকে বিশাল ফাটলের গহ্বরে। কিন্তু পানিটা ফাটলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কোথায়?

নায়াগ্রাম তাই একেবারে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কানাডা দ্রুতগতিতে পতন সমতল ভূমি প্রবাহিত হওয়া গহ্বর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কানাডা দ্রুতগতিতে পতন সমতল ভূমিতে প্রবাহিত গহ্বর

ক. হোঁচট খেলে ঠেকানো দায়।

খ. নদীর জল হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়।

গ. পাহাড়ের গায়ে গর্ত থাকলে তাকে আমরা বলি।

ঘ. আমরা ইঁটতে পারি।

ঙ. একটি বড় দেশ।

চ. ঢাকা শহর গড়ে উঠেছে, কিন্তু চট্টগ্রাম শহর সে রকম নয়।

৩. নায়াচোর উভয় শিথি ও বলি।

- নায়াচোর কোথায় অবস্থিত?
- নায়াচোর জলপ্রপাত এবং বর্ণীর মধ্যে পার্থক্য কী বুঝিয়ে দেখ?
- নায়াচোর জলপ্রপাতের বিশেষত্ব কী?
- নায়াচোর জল কোথায় যায়?
- ‘বিশ্ব-ভূমঙ্গল বড়ই বিচ্ছি’— ব্যাখ্যা কর।
- সাধারণ জলপ্রপাতের সঙ্গে নায়াচোর জলপ্রপাতের ভূলনামূলক আলোচনা কর।

৪. ঠিক উভয়টিকে ঠিক (✓) টিক দিই।

- ক. নায়াচোর কোথায় অবস্থিত?

- | | |
|------------|------------|
| ১. জাপান | ২. ভারত |
| ৩. কানাড়া | ৪. রাশিয়া |



- খ. নায়াচোর জলপ্রপাত গড়ছে—

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ১. পাহাড় থেকে | ২. সমতল ভূমি থেকে |
| ৩. কোন উচু স্থান থেকে | ৪. পাহাড় ঢল থেকে |

- গ. জলপ্রপাত দেখতে বাসে না থাবার কালুণ কী?

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ১. বাসের ভাড়া বেশি | ২. সেখানে বাস যায় না |
| ৩. বাসে ইচ্ছেমতো ধামা যায় না | ৪. বাসে সময় বেশি লাগে |

৫. ঢান দিক থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি আয়োজন শিথি।

ক. তখন আমিত পড়েছি জলপ্রপাতের কথা।

সৌভাগ্য

খ. জলপ্রপাত দেখার একবার হয়েছিল।

ফাঁটুল

গ. একদিন সঙ্গে গলের মজলিসে কথা উঠলো।

খরচোতা

ঘ. যে মাটির উপর দিয়ে এই নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে

নায়াচোর

সেখানে হঠাতে করেই এক বিশাল.....।

বন্ধুবাস্থবদের

৬. ক্ষেত্রগুলো কুবে নিই।

- জলপ্রসাপাত - পাহাড়ের উপর থেকে নিচে সমতল ভূমিতে বিশাল পরিধি নিয়ে জল পড়া।
- মজুলিস - পানপূর্জন করার আসর।
- জলের ধর্ম - জলের স্বভাব, জলের চরিত্র।
- বিশ্ব-ভূমতল - জগৎ, দুনিয়া।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

আমি কোথায় কোথায় বেড়াতে বা ফুরাতে গিয়েছি- তা মনে করার চেষ্টা করি। এর মধ্য থেকে থেকে কোনো একটি জায়গার বর্ণনা দিয়ে বস্তুর কাছে চিঠি লিখি (কোথায় গিয়েছিলাম, কবে গিয়েছিলাম, কীভাবে গিয়েছিলাম, কী কী দেখেছিলাম, কী করেছিলাম, কী খেয়েছিলাম, কেমন করে ফিরে এসেছিলাম)।

৮. নিচের অনুচ্ছেদটি পঢ়ি এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবি।

বিশ্ব-ভূমতল বড়ই বিচিত্র। কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে! পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রসাপাত বলা হয় নায়াঙ্গাকে। এই জলপ্রসাপাত পাহাড় থেকে নামে নি। সমতলের উপর দিয়ে একটি ধৰন্দোতা নদী বইছে। যে মাটির উপর দিয়ে এই ধৰন্দোতা নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে ইঠাই করেই এক বিশাল ফাটল। একটা নদী যতখানি চওড়া হতে পারে ততখানি ঝাঁক। নায়াঙ্গার জল ঐ ঝাঁকের ভিতরে চলে যাচ্ছে। এটাও তো প্রশাপাত, কারণ পানি পড়ছে। তবে, সাধারণ জলপ্রসাপাতের মতো পাহাড় থেকে নিচে পড়ছে না। পড়ছে, সমতল থেকে বিশাল ফাটলের গহ্বরে। নায়াঙ্গা তাই একেবারে ভিন্ন রূক্ষমের জলপ্রসাপাত।

ক. পৃথিবীর বৃহৎ জলপ্রসাপাত বলা হয় কোনটিকে?

খ. নায়াঙ্গা জলপ্রসাপাতের বৈশিষ্ট্য কী?

গ. নায়াঙ্গা জলপ্রসাপাত কোথা থেকে প্রবাহিত হয়?

ঘ. নায়াঙ্গাকে ভিন্ন রূক্ষমের জলপ্রসাপাত বলা হয়েছে কেন?



ରୌଦ୍ର ଶେଷେ ଜୟ

ଶାମସୁର ରାହମାନ

ବର୍ଷି ଏଠୋ ଆଜଳା ନିତେ,
ମାନୁଷ ମାନୁଷ କବ୍ରି ।
ପୁରୁଷ ଶହୀର, ପୁରୁଷ ଶ୍ୟାମଳ
ପ୍ରାମ ସେ ଶତ ଶତ ।

ହାନାଦାତେର ସଙ୍ଗେ ଛୋରେ
ଲଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧିସେନା,
ତାଦେର କଥା ଦେଶେର ମାନୁଷ
କଥନୋ ତୁଳବେ ନା ।

ଆବାର ଦେଖି ନୀଳ ଆକାଶେ
ପାହରା ମେଲେ ପାଥା;
ମା ହରେ ସାର ଦେଶେର ମାଟି,
ତାର ବୁକ୍ଫେତେଇ ଥାକା ।

କାଳ ଯେଥାନେ ଆଧାର ଛିଲ
ଆଜ ସେଥାନେ ଆଲୋ ।
କାଳ ଯେଥାନେ ମଦ ଛିଲ
ଆଜ ସେଥାନେ ଭାଲୋ ।

କାଳ ଯେଥାନେ ପରାଜ୍ୟେର
କାଳୋ ସଂଖ୍ୟା ହୟ,
ଆଜ ସେଥାନେ ନତୁନ କରେ
ରୌଦ୍ର ଶେଷେ ଜୟ ।



অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জ্ঞেনে নিই।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতি জয়লাভ করে ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ’ নামে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। আগে এ দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা জয়ী হয়েছিলেন। এই কবিতায় পাকিস্তানিদের অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কেন এদেশের সন্তানেরা সংগ্রাম করেছিল সে কথাও বলা হয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বর্গি হানাদার খাজনা

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

হানাদারদের বর্গি খাজনা

ক. সরকারকে দেওয়া সকল নাগরিকের কর্তব্য।

খ. বহু পূর্বে বাংলায় এসে হানা দিত, মানুষ মারত, ধনসম্পদ লুট করত।

গ. পরাজিত করেই মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশকে স্বাধীন করেছিলেন।

৪. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

ক. বর্গি এলো খাজনা নিতে,
মারল মানুষ কত।

‘খাজনা নিতে’ অর্থ লুটতরাজ করত। বর্গিরা বাংলাদেশে এসে মানুষ মেরে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে বাঙালির ধনসম্পদ নিয়ে পালিয়ে যেত।

খ. তাদের কথা দেশের মানুষ
কখনো ভুলবে না।

মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মানুষ কখনো ভুলবে না, কারণ তারাই হানাদার পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের এদেশ থেকে তাড়িয়েছিলেন।

গ. মা হয়ে যায় দেশের মাটি,
তার বুকেতেই থাকা।

মা ও মাতৃভূমি সমান গর্বের, সমান আনন্দের। জননীহীন সন্তান যেমন দুর্ভাগা, যার মাতৃভূমি নেই সেও তেমনি ভাগ্যহীন।

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

- ক. বার্ষিক কারাৱা! তাৱা কী কৱেছিল?
- খ. হানাদারদেৱ কথা মানুষ কেন সুনবে না?
- গ. মুক্তিবোধাদেৱ কথা মানুষ কথনো সুনবে না কেন?
- ঘ. মুক্তিসেনাবাৰা কাদেৱ সজ্জে মুখ কৱেছিল এবং কেন?
- ঙ. ‘কাল বেখানে আৰাব ছিল আজ সেখানে আলো।’— কথাটি ব্যাখ্যা কৰি।



৬. বিশ্লেষণ শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বলিবো বাব্য তৈরি কৰি।

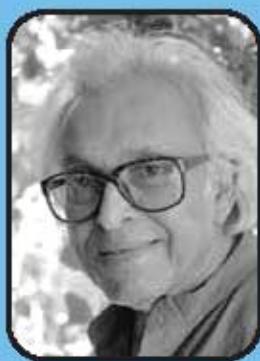
আৰাব	আলো	কালো	সাদা	ভালো	মন	অয়	প্ৰাঞ্চিয়	সকল	সন্ধ্যা
------	-----	------	------	------	----	-----	------------	-----	---------

- ক. বিশ্বকাপ ফুটবলে নিজ দলেৱ দেখে ছেলেটি আনন্দে লেচে উঠলো।
- খ. এককূশে ফেনুম্বাৰি আমৱা ব্যাজ পঞ্জে শহিদ মিনাজে ঘাই।
- গ. হওয়াৱ আগেই আমৱা বাঢ়ি পৌছে যাব।
- ঘ. নামলে ঘন অঙ্গদেৱ মধ্যে কিছুই দেখা যায় না।
- ঙ. ছেলেৰ সজ্জ ভ্যাগ কৱাই উন্নত।

৭. কবিতাটি আৰুণ্তি কৰি ও মা দেখে লিখি।

৮. কৰ্ত্ত-অনুশীলন।

পাঠ্যবইয়েৰ বাইত্তোৱ কোনো কবিতা বা ছড়া গড়ে তা প্ৰেণিতে আৰুণ্তি কৰি।

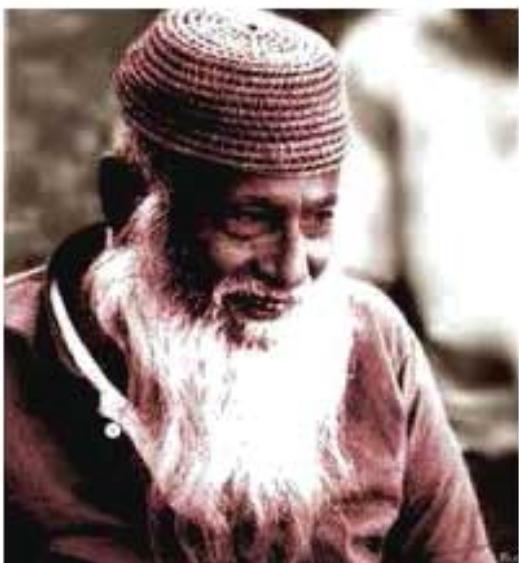


শামসুর রাহমান

কবি-গবিন্দিটি

কবি শামসুর রাহমান ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবৰে পুৱানো ঢাকাৱ যাহুতালিতে জন্মগ্ৰহণ কৱেন। তাৰ শৈক্ষিক নিবাস নৱাসিঙ্গী জেলাৱ পাড়াতলী থামে। তিনি দীৰ্ঘদিন সাংবাদিকতা পেশায় লিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাহাদুদেশেৱ একজন প্ৰথান কবি। ছেটদেৱ জন্য তিনি অনেক ছড়া, কবিতা ও মৃত্তিকথা লিখেছেন। ‘এলাটিং কেলাটিং’, ‘ধান ভানলে কুড়ো দেবো’, ‘মৃত্তিৰ শহুৰ ঢাকা’ ইত্যাদি ছেটদেৱ জন্য দেখা তাৰ বিখ্যাত বই। তিনি ২০০৬ সালেৱ ১৭ই আগস্ট ঢাকাৱ মৃত্যুবৰণ কৱেন।

মঙ্গলা আবদুল হামিদ খান ভাসানী



মঙ্গলা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

বালাই কৃষক মঙ্গল হামিদের অতি আগসত্তম, মঙ্গলা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। চিরকাল নির্বাচিত, নিশাপুরি মানুকের কাছাকাছি এসে দাঢ়িয়েছেন তিনি। মঙ্গলুম মানুকের সূর্য-দূর্ঘৰ্ষে কৌশল কাথ পিণিয়ে ভাসের কথা বলেছেন। সক্ষম করেছেন। এজন্য তিনি মঙ্গলুম অসমের।

সিরাজপুরের খাসগড়া প্রাদের এক পরিষ্ঠ কৃষক পরিবার। এ পরিবারে আবদুল হামিদ খানের জন্ম হয় ১৮৮০ সালে। তাঁর বাবার নাম হাজী শরফত আলী খান। মাঝের সাম মোসামুদ মজিজল বিবি। জীবন বয়সেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। তাঁর এক চাচা ইন্দ্রাবীয় খান তাঁকে পৈশবে আনেন দেন। এই

চাচার কাছ থেকেই তিনি মাদরাসার পড়ালোনা করেন। এ সময় তিনি ইংরাজ থেকে আগত এক শীর সাহেবের স্নেহসূচি শাল করেন। তিনি তাঁকে তারজের দেশবন্দ মাদরাসার পাঠিয়ে দেন। এ সময় তিনি দেশাব্দৰোধে উত্তুল্য হন।

মাদরাসার পড়া শেষ করে তিনি টাঙাইলের কাশমাদির এক পাইমারি কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এখানে শিক্ষকতার সময় তিনি অমিদাজের অভ্যাচন, নির্বাচন মেধাতে পান। এর বিস্তৃত প্রতিবাদ ও সক্ষম শুরু করেন। কুলে অমিদাজের বিষ-সজ্ঞার পত্ত তাঁকে কাশমারি ছাড়তে কর।

বাইশ বছর বয়সে কল্পন নেতা দেশবন্দু চিকিৎসন মাশের আদর্শে তিনি অনুপ্রাপ্তি হন। প্রেত তিনি মাজনীতিতে সূজা হন। ধরণের অসহযোগ আলোচনে ঘোল দেন। তাঁকে কালাহুম করা হয়। সঙ্গের মাস পর তিনি মৃত্যু পান। এরপর ১৯২৪ সালে সিরাজপুরে তিনি এক সতার তাবণ দেন। এই তাবণে তিনি কৃষক সাধারণের উপর অধিদারদের শোষণ, নিশাফুন ও অভ্যাচাজের কাহিনি কুলে থেরেন। এই সতার তাবণের অন্য তাঁকে নিজের অন্তর্ভুমি ছাড়তে হয়। তিনি ধরান চলে বাস আসামের অসমেরে। এ কল্পনাই আসামের দুর্বাতি জেলার ভাসানচরে তিনি এক বিশাল প্রতিবাদী সমাবেশের আত্মাজন করেন। এ সতার তিনি বাড়াগি কৃষকদের উপর অভ্যাচাজের উপর বিস্তৃত প্রতিবাদ জানান। এই সমাবেশেই সাধারণ কৃষকরা তাঁকে ভাসানচরের মঙ্গলামা সাম

দেয়। পরে তাঁকে ভাসানী নাম দেয়। তখন থেকেই তাঁর পরিচয় হয় মণ্ডলা ভাসানী। মণ্ডলা ভাসানী এদেশে একটি শ্রিয় নাম।

মণ্ডলা ভাসানী তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, ‘আমি খেটে-খাওয়া মানুষের কথা বলি। এই মানুষেরা কাজ করে খেতে-খামারে, কাজ করে কলে-কালখানায়। এরা কৃষক, এরা শ্রমিক। আর এরাই জমিদার, মহাজন, মাণিকের জন্মের শিকার হয়।’

মূলত সারা জীবন তিনি এই নিপীড়িত মানুষের জন্যই সঞ্চাম করেছেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তিনি আসাম থেকে পূর্ববাহ্য চলে আসেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সংগঠনের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। তিনি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে বাস করতে শুরু করেন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে তিনি আবার প্রেক্ষণে হন।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি শেরে বাহার এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহোগ্যাদীর সঙ্গে মুক্তফুল গঠন করেন। মুক্তফুল এ নির্বাচনে বিশুল ভোটে জয়ী হয়।

১৯৫৭ সালে ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারিতে এক বিশাল আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলন ‘কাগমারি সম্মেলন’ নামে খ্যাত। সম্মেলনে যোগ দেন দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ। এ সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঙ্গলার চির ভূলে ধরেন।

মণ্ডলা ভাসানী বুবাতে পেরেছিলেন পাকিস্তানের পশ্চিম অঞ্চলের শাসকরা ধর্ম ও জাতীয় সংহতির নামে পূর্ববাহ্য মানুষকে শোষণ করছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানি বৈরোচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে তিনি পন্টন ময়দানে ভাষণ দেন। এই ভাষণে শোষণের এই কথাটিই বারবার উচ্চারণ করে জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন— পাকিস্তানি সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাচ্ছে, এরূপ চলতে থাকলে পূর্ব পাকিস্তান একদিন ঝাবীন দেশ হয়ে যাবে।



মণ্ডলা ভাসানী হাবিব খান ভাসানী সংস্থা মণ্ডলে ভাষণ দেন



মণ্ডলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে দেশব্যাপী পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যায়জ্ঞ শুরু হয়। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মণ্ডলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা পুড়িয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি ভারতে চলে যান। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাহ্লাদেশ সরকারের উপদেষ্টাপরিষদের সদস্য ছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আজসর্পণ করলে তিনি

স্বাধীন বাহ্লাদেশে ফিরে আসেন। স্বাধীনতার পরও কোনো পদব্যাপার ও মোহ ঠাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। তিনি সবসময় জনগণের পাশে থেকে বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচি পালন করেন।

মণ্ডলানা ভাসানী নিজে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া করতে পারেন নি। কিন্তু এ দেশের মানুষের শিক্ষা প্রসারে তাঁর অনেক অবদান ছিল। তিনি সন্তোষে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মহীপুরে হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ, ঢাকায় আবুজর গিফারি কলেজ এবং টাঙ্গাইলে মণ্ডলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

মণ্ডলানা ভাসানী ছিলেন একজন নিরহংকার আদর্শবান মানুষ। তাঁর জীবনচরণ ছিল অত্যন্ত সাদামাটা ও সহজ-সরল। তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষে একটা সাধারণ বাড়িতে বাস করতেন। খেতেন সাধারণ মানুষের খাবার। এরকম অনাড়ুন্ডর জীবনযাপন খুব কম দেখা যায়।

১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর মণ্ডলুম জননেতা মণ্ডলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৬ বছর বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের দেশের রাজনীতিতে একটি যুগের অবসান ঘটে। তাঁকে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

মণ্ডলানা ভাসানীর জীবন থেকে আমরা প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম, প্রগতিশীল আদর্শ ও প্রতিবাদী চেতনার শিক্ষা পাই। তিনি চিরকাল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বেঁচে থাকবেন এ দেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নির্যাতিত নিপীড়িত মজলুম বিষ-নজর কারাবুদ্ধ প্রতিবাদী সমাবেশ^১
কাগমারি সম্মেলন প্রবাসী আত্মসমর্পণ মোহ অনাড়ম্বর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রবাসী আত্মসমর্পণ মোহ সরকার প্রতিবাদী

ক. যুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ হয়ে উঠেছিল।

খ. আজ প্রায় বিশ বছর ধরে আনিস সাহেব

গ. ছাড়া দেশ চালানো মুশকিল।

ঘ. সৎলোকের ধনসম্পত্তির উপরে থাকে না।

ঙ. পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর করে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. মজলুম জননেতা কে ছিলেন? কেন তাকে মজলুম জননেতা বলা হয়?

খ. মওলানা ভাসানী কোথায় পড়াশোনা করেন?

গ. কেন তাকে কাগমারি ছাড়তে হয়েছিল?

ঘ. কীভাবে তার নাম মওলানা ভাসানী হলো?

ঙ. পল্টন ময়দানের ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার বিষয়বস্তু কী?

চ. শিক্ষার ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী কী অবদান রেখেছেন?

ছ. মওলানা ভাসানীর জীবন থেকে তুমি কী শিখতে পেরেছ?

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি।

মজলুম কারাবুদ্ধ প্রতিবাদ অনাড়ম্বর মোহ আত্মসমর্পণ নিপীড়িত

৫. জেনে নেই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ- ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের একজন মহান নেতা। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ১৮৭০ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের মুস্লিগঞ্জ জেলার তেলিরবাগ গ্রামে। তিনি যেমন ছিলেন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, তেমনি ছিলেন একজন কবি ও সম্পাদক। এ দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সম্মুতি প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলার সাধারণ মানুষের অতি প্রিয় নেতা। ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা লিখে শৃঙ্খা জানান।

৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. মওলানা ভাসানী চিরকাল কেমন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন?

- | | |
|--------------|------------|
| ১. নির্যাতিত | ২. অবহেলিত |
| ৩. সুখী | ৪. বড়লোক |

খ. মওলানা ভাসানী কোন পীর সাহেবের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন?

- | | |
|-----------|----------------|
| ১. ইরাকের | ২. বাংলাদেশের |
| ৩. ভারতের | ৪. পাকিস্তানের |

গ. তাঁকে কাগমারি কেন ছাড়তে হয়?

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ১. গ্রামের মানুষের কারণে | ২. জমিদারদের কারণে |
| ৩. ব্যবসায়ীদের কারণে | ৪. রাজনৈতিক কারণে |

ঘ. মওলানা ভাসানী তাঁর এক ভাষণে কী বলেছেন -

- | |
|------------------------------------|
| ১. আমি খেটে-খাওয়া মানুষের কথা বলি |
| ২. আমি আরামপিয় মানুষের কথা বলি |
| ৩. আমি সুখী মানুষের কথা বলি |
| ৪. আমি ভালো মানুষের কথা বলি |

ঙ. মওলানা ভাসানী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর
সঙ্গে গঠন করেন-

- | | |
|-----------------|---------------|
| ১. যুক্তফ্র্স্ট | ২. যুক্তদল |
| ৩. যুবদল | ৪. যুবফ্র্স্ট |

চ. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টাপরিষদের কী ছিলেন ?

- | | |
|-----------|----------------|
| ১. সদস্য | ২. প্রেসিডেন্ট |
| ৩. সহকারী | ৪. কেউ নন |

ছ. তিনি কোন নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে যুক্ত হন ?

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ১. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী | ২. দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জন দাশ |
| ৩. শেরে বাংলা ফজলুল হক | ৪. শেখ মুজিবুর রহমান |

৭. বাক্যের সাথে মিল করে ঠিক শব্দের উপর টিক (✓) টিক দিই।

ক. মজলুম মানুষের সুখে দুঃখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা বলেছেন—মওলানা
ভাসানী/শেরে বাংলা/ শহীদ সোহরাওয়ার্দী

খ. মওলানা ভাসানী কারাবুদ্ধ হওয়ার পর মুক্তি পান—তেরো/ পনেরো/ সতেরো মাস পরে

গ. তাঁকে ভাসানী নাম দেয়—ভাসানচরের/ কাগমারীর/ ঢাকার সমাবেশের পর

ঘ. মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা—পুড়িয়ে দেয়/ পাহারা দেয়/
তাদের দখলে নিয়ে নেয়



শহিদ তিতুমীর

তেতো, তিতু, তিতুমীর। শুনতে বেশ অবাক লাগছে, তাই না? তা হলে খুশেই বলি।

১৭৮২ সাল। পশ্চিমবঙ্গের চবিষ্ণু পরগনা জেলা। সে জেলার বশিরহাট মহকুমার একটি গ্রাম চানপুর (মতাঙ্গের হায়দারপুর)। এ গ্রামে বাস করত এক বনিয়াদি মুসলিম পরিবার। সৈয়দ বংশ। এই বংশে জন্ম নেয় এক শিশু। ছোট শিশুটি ছিল যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি বলিষ্ঠ তার গঢ়ন। শিশুটি ছিল খুব জেদি। শিশুকালে তার একবার কঠিন অসুব হলো। গ্রাম সামান্যের জন্য তাকে দেওয়া হলো ভীষণ তেতো ওষুধ। এমন তেতো ওষুধ শিশু তো দূরের কথা বুঝেও মুখে নেবে না। অথচ এই ছোট শিশু বেশ খুশিতেই খেল সে ওষুধ। প্রায় দশ-বারোদিন এই তেতো ওষুধ খেল সে। বাড়ির লোকজন সবাই অবাক। এ কেমন শিশু, তেতো খেতে তার আনন্দ! এ জন্যে ওর ডাক নাম রাখা হলো তেতো। তেতো থেকে তিতু। তার সাথে মীর লাগিয়ে হলো তিতুমীর। তাঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী।

তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন আমাদের বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন। চলছে ব্রিটিশ রাজত্ব। ইংরেজরা চালাত অভ্যাচার। অন্যদিকে ছিল দেশি জমিদারদের জুলুম। ইংরেজ কর্মচারীরা ঘোঁফা ছুটিয়ে চলত দারুণ দাপটে। তিতুমীর এসব দেখতেন আর ভাবতেন, এদের হাত থেকে কীভাবে মুক্তি পাবে দেশের মানুষ।

তিতুমীরের গ্রামে ছিল একটি মাদরাসা। সেখানে শিক্ষক হিসেবে এলেন ধর্মপ্রাণ এক হাফেজ। নাম হাফেজ নেয়ামত উল্লাহ। তিতুমীর এ মাদরাসায় পড়তেন। তিনি অল্প সময়েই হাফেজ নেয়ামত উল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন।

সেকালে গ্রামে গ্রামে ডনকুষ্টি আর শরীরচর্চার ব্যায়াম হতো। শেখানে হতো মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা, তীর ছেঁড়া আর অসিচালনা। উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ তাড়ানোর জন্য গায়ে শক্তি সঞ্চয় করা। তিনি ডনকুষ্টি শিখে কুষ্টিগির ও পালোয়ান হিসেবে নাম করলেন। লাঠিখেলা, তীর ছেঁড়া আর অসি পরিচালনাও শিখলেন। তাঁর অনেক ভক্তও জুটে গেল। তিতুমীরের গায়ে শক্তি ছিল প্রচুর। কিন্তু তিনি ছিলেন শাস্ত ও ধীর স্বভাবের।

একবার ওষ্ঠাদের সঙ্গে তিনি বিহার সফরে বেরোলেন। মানুষের দুরবস্থা দেখে তাঁর মনে দেশকে স্বাধীন করবার চিন্তা এলো। তিনি মুসলমানদের সত্যিকার মুসলমান হতে আহ্বান জানালেন। আর হিন্দুদের বললেন অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়াতে। হিন্দু-মুসলমান সকলে তাঁর কথায় সাড়া দিলেন।

১৮২২ সাল। তিতুমীরের বয়স তখন চল্লিশ। তিনি হজ পালন করতে গেলেন মক্কায়। সেখানে পরিচয় হলো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হ্যরত শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সঙ্গে। তিনি ছিলেন সংগ্রামী পুরুষ এবং ধর্মপ্রাণ। তিতুমীর তাঁর শিষ্য হলেন। দেশে ফিরে তিনি স্বাধীনতার ডাক দিলেন। ডাক দিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে, নীলকরদের বুখতে আর নিজেদের সংগঠিত হতে। কিন্তু প্রথম বাধা পেলেন জমিদারদের কাছ থেকে। তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু হলো। নিজ গ্রাম ছেড়ে তিনি গেলেন বারাসাতের নারকেলবাড়িয়ায়। নারকেলবাড়িয়ার লোকজন তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলো। হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তৈরি করলেন এক দুর্ভেদ্য বাঁশের দুর্গ। এটাই নারকেলবাড়িয়ার ‘বাঁশের কেল্লা’। তাঁর এ কেল্লায় সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল চার-পাঁচ হাজার। চবিশ পরগনা, নদীয়া আর ফরিদপুর জেলা তখন তাঁর দখলে। ইংরেজদের কোনো কর্তৃত রইল না এসব অঞ্চলে। এ দুর্গে তিনি তাঁর শিষ্যদের লড়াইয়ের শিক্ষা দিতে লাগলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করার কৌশল ও প্রস্তুতি শেখাতে লাগলেন। এ খবর চলে গেল ইংরেজ শাসকদের কাছে। ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলাল দেশি জমিদাররা। ১৮৩০ সালে ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে পাঠানো হয় তিতুমীরকে দমন করবার জন্য। কিন্তু আলেকজান্ডার তাঁর সিপাহি বাহিনী নিয়ে পরাস্ত হন তিতুমীরের হাতে। তারপর তিতুমীর কয়েকটি নীলকুঠি দখল করে নেন।

১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঞ্জ তখন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল। তিতুমীরকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি পাঠালেন বিরাট সেনাবহর আর গোলন্দাজ বাহিনী। এর নেতৃত্ব দেওয়া হলো সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্টকে। স্টুয়ার্ট আক্রমণ করলেন তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা। তখন ভালো করে ভোর হয়নি। আবছা আলো। স্টুয়ার্টের ছিল হাজার হাজার প্রশিক্ষিত সৈন্য আর অজন্ম গোলাবাবুদ। তিতুমীরের ছিল মাত্র চার-পাঁচ হাজার স্বাধীনতাপ্রিয় সৈনিক। তাঁর না ছিল কামান, না ছিল গোলাবাবুদ, বন্দুক। তবে তাঁদের মনে ছিল পরাধীন দেশকে স্বাধীন করবার অমিত তেজ।

প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। তিতুমীর আর তাঁর বীর সৈনিকরা প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ইংরেজ সৈনিকদের গোলার আঘাতে ছারখার হয়ে গেল নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা। শহিদ হলেন বীর তিতুমীর। শহিদ হলেন অসংখ্য মুক্তিকামী বীর সৈনিক। তিতুমীরের ২৫০ জন সৈন্যকে ইংরেজরা বন্দি করল। কারো হলো কারাদণ্ড, কারো হলো ফাঁসি। এভাবেই শেষ হলো যুদ্ধ। কিন্তু এ যুদ্ধের বীর নায়ক তিতুমীর অমর হয়ে রইলেন এ দেশের মানুষের মনে। আজ থেকে প্রায় পৌনে দু শ বছর আগে তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে বীর তিতুমীরই হলেন বাংলার প্রথম শহিদ।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

জেদি পরাধীন দাপটে ডনকুষ্টি অসিচালনা দুর্ভেদ্য দুর্গ বাঁশের কেল্লা
শায়েস্তা অমিত তেজ মুক্তিকামী

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পরাধীন	ডনকুষ্টি	অসিচালনা	দুর্গ	দাপটে	মুক্তিকামী
--------	----------	----------	-------	-------	------------

- ক. তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন আমাদের বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষ ছিল ।
- খ. ইংরেজ কর্মচারীরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলত দাবুণ ।
- গ. তিনি লাঠিখেলা, তীর ছোঁড়া আর শিখলেন।
- ঘ. সেকালে গ্রামে গ্রামে আর শরীরচর্চার ব্যায়াম হতো।
- ঙ. শহিদ হলেন অসংখ্য বীর সৈনিক।
- চ. হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তৈরি করলেন বাঁশের ।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

- ক. ‘তিতুমীর’ নামটি কেমন করে হলো? তাঁর প্রকৃত নাম কী?
- খ. এ দেশকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করার চিন্তা কেন তাঁর মনে এলো?
- গ. তিন্দু-মুসলমান সবাইকে তিনি কী বলে একতাবন্ধ করতে চাইলেন?
- ঘ. ইংরেজদের পাশাপাশি কারা এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাত?
- ঙ. নারকেলবাড়িয়া কোথায়? এখানে তিতুমীর কী তৈরি করলেন?
- চ. কত স্থিষ্টান্দে তিতুমীরের কাছে ব্রিটিশ শক্তি পরাজিত হয়?
- ছ. কখন কোন ইংরেজ সেনাপতির নেতৃত্বে তিতুমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হয়?
- জ. তিতুমীর কীভাবে শহিদ হলেন?
- ঝ. পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম শহিদ কে?
- ঞ. শহিদ তিতুমীর কেন অমর হয়ে আছেন?

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি।

বাঁশের কেল্লা জেদি সশন্ত শায়েস্তা প্রিয়পাত্র দুর্ভেদ্য

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) টিক দিই।

- ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী?

১. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
২. সৈয়দ মীর নিসার আলী
৩. মোঃ শামসুল হক
৪. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

- খ. তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন এদেশ কাদের অধীন ছিল?

- | | |
|---------------|----------------|
| ১. ফরাসিদের | ২. ডাচদের |
| ৩. ব্রিটিশদের | ৪. পর্তুগিজদের |

- গ. মকায় কোন সংগ্রামী পুরুষ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সাথে তিতুমীরের পরিচয় হয়েছিল?

১. হ্যরত শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সঙ্গে
২. হাফেজ নেয়ামত উল্লার সঙ্গে
৩. গোলাম মাসুদের সঙ্গে
৪. হ্যরত আলী (রা) এর সঙ্গে

- ঘ. তিতুমীরের দুর্গের নাম কী?
১. লাঠির কেল্লা
 ২. লোহার কেল্লা
 ৩. বেতের কেল্লা
 ৪. বাঁশের কেল্লা
- ঙ. তিতুমীর ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে কত সালে পরাজিত করেন?
১. ১৮২২
 ২. ১৮৩০
 ৩. ১৮৩১
 ৪. ১৮৩৪
- চ. তিতুমীর ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন কেন?
১. তাঁর সৈনিকদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে
 ২. প্রশিক্ষিত সৈন্য ও উন্নত অস্ত্র-শস্ত্রের অভাবে
 ৩. সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে
 ৪. অদৃৰদর্শিতার কারণে

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

পরাধীন	স্বাধীন	বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ।
তেতো	-----	-----
পরাস্ত	-----	-----
দুর্বল	-----	-----
আনন্দ	-----	-----
শান্ত	-----	-----

৭. কর্ম-অনুশীলন।

শহিদ তিতুমীরের ‘বাঁশের কেল্লা’ সম্পর্কে যা জান লিখি।

অপেক্ষা

সেলিনা হোসেন

রুমা আৰ রুবা দুই বোন। ওদেৱ খুব ভাব। একসঙ্গে ক্ষুলে যায়। একসঙ্গে খেলে। খুব কমই
ঝগড়া হয় ওদেৱ।

রুমাৰ বয়স বাবো আৰ রুবাৰ দশ।

দুই জনেৱ জন্মদিন নিয়ে ওদেৱ মা-বাবাৰ এক একটি গল্প আছে। ওদেৱ মা রাহেলা বলে,
যেদিন রুমাৰ জন্ম হয় সেদিন বাড়িৰ উঠোনেৱ শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে ভৱে ছিল। এত ফুল
নাকি আৰ কখনো দেখে নি রাহেলা বানু। খুশবু ছড়িয়ে গিয়েছিল চারদিকে।

রুবা উদগ্ৰীব হয়ে বলে, মা আমাৰ গল্পটা বল।

তোৱ গল্পটা আমি বলব, মা। এ কথা বলে জসীম মিয়া মেয়েকে জড়িয়ে ধৰে। বলে, যেদিন তুই
হলি সেদিন বাড়িৰ বাইরেৱ আমগাছটাৰ নিচে বসে আছি। হঠাত মাথাৰ ওপৱে তাকিয়ে দেখি
আমেৱ বোলে ভৱে আছে গাছটা। এত বোল আসতে দেখি নি আগে। বোলেৱ গন্ধে চারদিক ভৱে
গেছে।

দুই বোন মা-বাবাৰ আদৱেৱ ছায়ায় বড় হয়। ক্ষুলে যাওয়াৰ পথে বুনোফুল ছিঁড়ে বেণীৰ সঙ্গে
গেঁথে রাখে। ফড়িং ধৰে। আবাৰ আকাশে উড়িয়ে দেয়। ফুলেৱ পাপড়ি ছিঁড়ে খাতাৰ ভিতৱ চাপা
দিয়ে রাখে। শুকিয়ে গেলে বাবাৰ কপালে লাগিয়ে দিয়ে বলে, বাবা তোমাৰ হাজাৰ বছৱ আয়ু
হোক। মায়েৱ কপালে লাগিয়ে দিয়ে বলে, মা তোমাৰ ভাতেৱ হাঁড়ি ভৱা থাকুক।

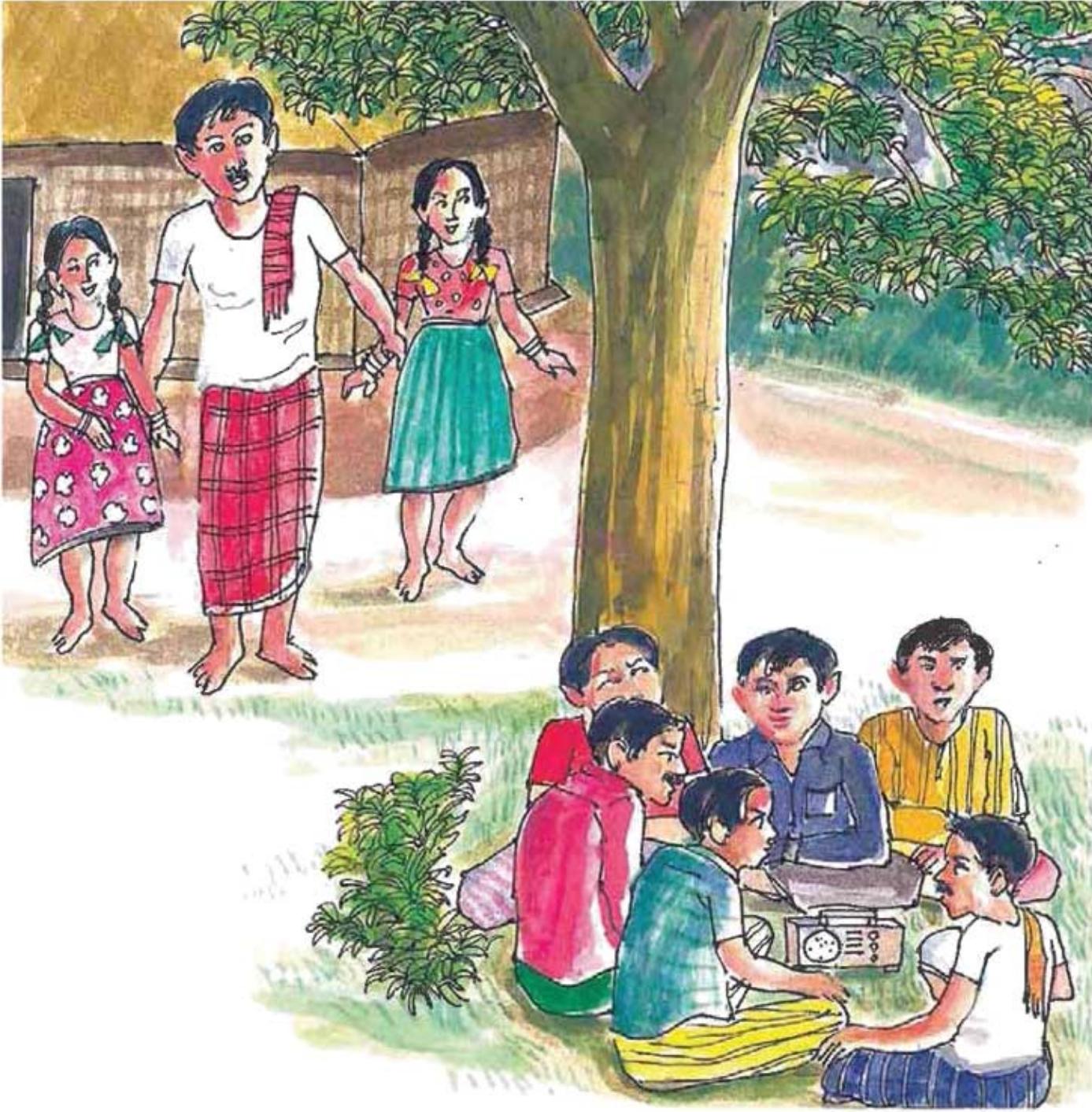
জসীম মিয়া ওদেৱ কপালে চুমু দিয়ে বলে, আমাৰ মেয়েগুলোৰ অনেক বুদ্ধি। অনেক বড় হ, মা।
চাইলে লেখাপড়াৰ জন্য তোদেৱ আমি ঢাকা পাঠাব।

দুই বোন খুশিতে হাততালি দেয়। মা-বাবা ওদেৱ উৎফুল্ল মুখেৱ দিকে তাকিয়ে থাকে। একদিন
জসীম মিয়া বাজাৰে যায়। সেখান থেকে দুই সেৱ চাল-ডাল কিনে বাড়ি ফিরে বারান্দায় ধপাস
কৱে বসে পড়ে। ছুটে আসে রাহেলা বানু।

— কী হয়েছে?

— যুদ্ধ।

— যুদ্ধ? রাহেলা বানু অবাক হয়ে বলে।



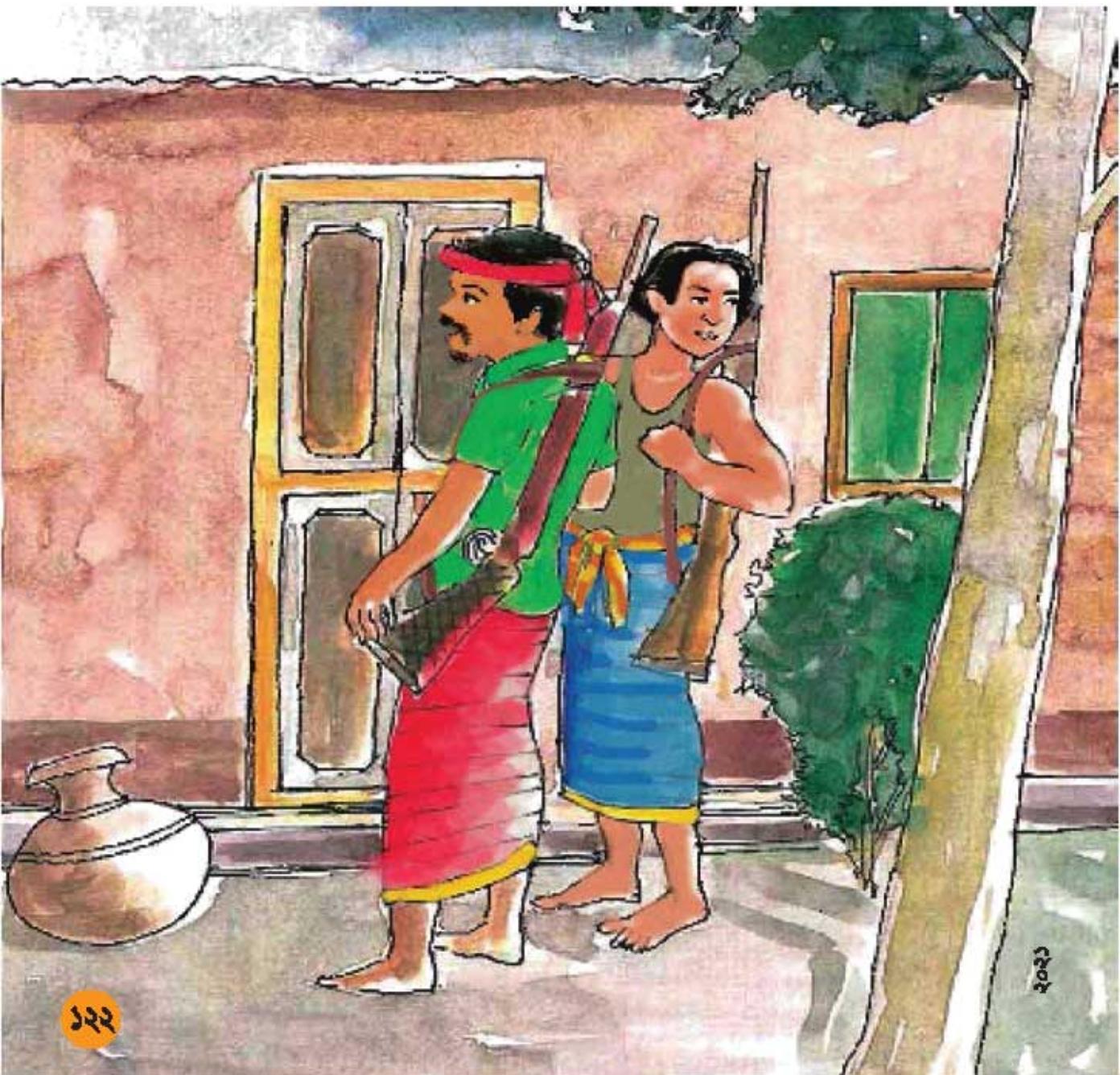
କିଛୁ ବାର ଆଗେଇ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ପାର ବାଇରେ ହଇଛି । ଓ ଦୁଇ ମେଧେର ହାତ ଧରେ ବାଇରେ ଆସେ । ଦେଖେ ଲୋକଙ୍କର ଆମଗାହେର ନିତେ ଗୋଲ ହୁଏ ବସେ ବ୍ରେତାଣେ ଖବର ଶୂନ୍ୟ । ବିବିସିର ଖବରେ ବଳାହେ, ଢାକା ଶହରେ ଗତ ମଧ୍ୟରାତରେ ଗନ୍ଧଭ୍ୟା ଶୁରୁ କରେଛେ ପାକିସ୍ତାନି ସେନାବାହିନୀ ।

ଜ୍ଞାନମେର ମନେ ପଡ଼େ କିଛୁଦିନ ଆଗେ ଖରା ବଜାକମ୍ପୁର ଷହି ମାର୍ଟ୍ଟର ଭାଷଣ ଶୂନ୍ୟିଲା—‘ଏବାରେର ସଖ୍ୟାମ ଆମାଦେଇ ଯୁଦ୍ଧର ସନ୍ଧାମ । ଏବାରେର ସନ୍ଧାମ ଆଧୀନତାର ସନ୍ଧାମ ।’

ଲୋକଜନ ଖବର ଶୁଣେ ଉତ୍ସେଞ୍ଜିତ ହୁଏ ବଲେ, ଆମାଦେଇ ସବାଇକେ ଯୁଦ୍ଧ କରାତେ ହବେ ।

ଗୁମ୍ଫା-ରୂପା ବାବାର ହାତ ଛାଡ଼ିଯେ ଅନ୍ୟ ହେଲେମେଯେଦେର କାହେ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ବଳାର ଜଳ୍ପ୍ଯ ଛୁଟ ଦେଇ ।
ଚିତ୍କାର କରେ ବଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରାତେ ହବେ ରେ । ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ।

କଥେକମାତ୍ର ପରେ ଗୀରେ ମିଳିଟାରି ଆସେ । ଜୁମ୍ମି ଶହର ଥିକେ ଆସା ହେଲେଦେର କାହ ଥିକେ ରାଇଫେଲ
ଚାଲାନୋ ଶିଖେ ଲେଇ । ଡାରପର ପଡ଼ୁ ତୋଳେ ମୁକ୍ତିବାହିନୀ । ରାହେଲା ମେଯେଦେର ନିଯେ ବାଡ଼ିତେ ଥାକବେ ।
ଜୁମ୍ମି ଚେଯେଛିଲ ରାହେଲା ଓ ବାବାର ବାଡ଼ି ଚଲେ ଥାକ, କିମ୍ବୁ ରାହେଲା ସେତେ ରାଜି ହୁଏ ନି ।



নদীর ধারেই বাজার। সেদিন বিকেলে বাজারে গেলে পাকিস্তানি মিলিটারির সামনে পড়ে যায় জসীম। ওরা বাজারের দোকান ও ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসে। একটি বুলেট এসে লাগে জসীমের বুকে। নদীর ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় ও। রক্তে ভেসে যায় মাটি। নিজেরই রক্তে মাখামাখি হয়ে যায় ওর শরীর।

মিলিটারিই চলে গেলে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা ঘরে ফিরে আসে। রাহেলাও মেয়েদের নিয়ে আসে বাড়িতে। অনেক বাড়ি পুড়ে গেলেও ওদের বাড়িতে আগুন লাগে নি। বড় আমগাছটা ঘরের চাল আড়াল করে রেখেছে বলে আগুন এখানে আসতে পারে নি।

রাহেলা সারা রাত জসীমের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু জসীম বাড়ি ফেরে না। রুমা-রুবা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে যায়।

পরদিন গাঁয়ের লোকেরা জসীমের লাশ নিয়ে আসে বাড়িতে। রুমা-রুবা কিছুক্ষণ বাবাকে দেখে নিশ্চুপ হয়ে যায়। যেন ওরা কথা বলা ভুলে গেছে। রাহেলা তো বারবার জ্ঞান হারাচ্ছে। গাঁয়ের মেয়েরা ওদের মাকে দেখাশোনা করছে। দুই বোন রান্নাঘরের দরজায় চুপ করে বসে থাকে।

রুবা রুমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, যুদ্ধ মানে কী বুবু?

রুমা দুই হাতে চোখ মুছে বলে, বাবার মরে যাওয়া।

দুই জন আকাশের দিকে তাকায়। অনেক দূরে কালো ধোয়ার মতো কিছু একটা আকাশের দিকে উঠছে। উঠছে তো উঠছেই।

ওরা বুবাতে পারে পাশের গ্রামে আগুন দিয়েছে পাকিস্তানি মিলিটারি।

দুই বোন আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। দুই জনেই বুবাতে পারে যুদ্ধ মানে কী!

ঘোর বর্ষা। বৃষ্টির তোড়ে ডুবে যায় মাঠঘাট। রাহেলা বানু শুকনো মুখে বারান্দায় বসে থাকে। দুই বোন ধানখেতের আলের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া পানি থেকে কুঁচো চিংড়ি ধরে আনে। ওদের মা অন্যের বাড়ি থেকে আনা চালে ভাত রান্না করে।

দু-মুঠো চাল মাটির কলসিতে জমিয়ে রাখে রাহেলা বানু। রাতে কোনো মুক্তিযোদ্ধা এলে তার জন্য ভাত রান্না করবে। দুই বোন শুকনো লাকড়ি কুড়িয়ে এনে রান্নাঘরে জমিয়ে রাখে। যদি লাকড়ির দরকার হয় তখন কী দিয়ে ভাত রান্না করবে মা? দুই বোন অধীর অপেক্ষায় থাকে।

২৩ সে রাতে বৃষ্টি ছিল না। জ্যোৎস্নায় ভরা ছিল উঠোন।

গভীর রাতে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা আসে ওদের বাড়িতে।

চুপিচুপি ডাকে, মা দরজা খোল মাগো—

রংবা ধড়মড়িয়ে উঠে রুমাকে ডাকে। ও ঠে঳ে মাকে জাগায়।

— মা ওঠো। শোন, কেউ এসেছে। রাহেলা বানু দরজায় টুকটুক শব্দ শোনে। দরজার কাছে গেলে আবার শুনতে পায় সে ডাক, মা দরজা খোল।

রাহেলা কাঁপা হাতে দরজা খুললে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

ওদের একজন বলে, ট্রেনিংয়ের সময় জসীম কাকু আমাদের বলেছিলেন দরকার হলে যেন আপনার কাছে আসি।

— মা, আপনি আমাদের চিনবেন না। আমাদের থিদে পেয়েছে। ভাত খেয়েই চলে যাব।

— কোথায় যাবে? রুমা জিজ্ঞেস করে।

— নদীর ওপারে। ওখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প আছে।

— তোমরা যুদ্ধ করবে? রুবা জানতে চায়।

— হ্যাঁ, আমরা পাকিস্তানি মিলিটারির ক্যাম্প আক্রমণ করব।

— তোমাদের রাইফেলগুলো ছুঁয়ে দেখি? রুমা গভীর আবেগে বলে।

— হ্যাঁ, দেখ।

দুজনে দুবোনের কোলে রাইফেল দুটো দিয়ে দেয়। রাইফেল দুটো ওরা কোলে নিয়ে বসে থাকে। মা রান্না চড়ায়। কিছুক্ষণ পর রাহেলা গরম ভাত নিয়ে আসে গামলা ভরে। সঙ্গে ডিম-আলুর তরকারি। যোদ্ধা দুইজন গপগপিয়ে খায়। দেরি করার সময় নেই। নদীর ঘাটে ওদের জন্য নৌকা নিয়ে বসে আছে অন্যরা। দেরি করা চলবে না। খাওয়া শেষ হলে রাহেলা বলে, তোমরা আবার আসবে তো?

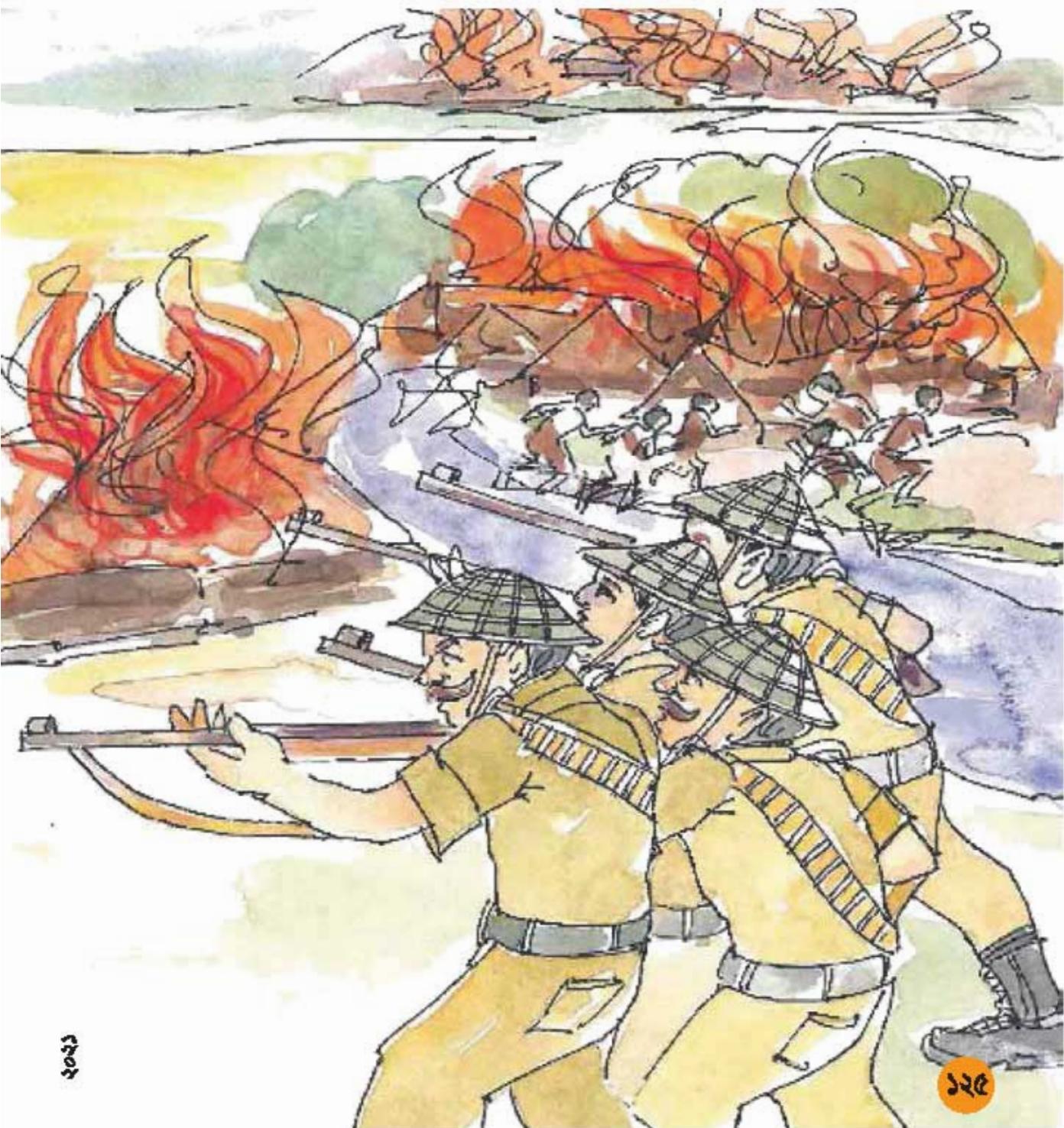
দরকার হলে আসতে পারি। নইলে অন্যেরা আসবে। কেউ না কেউ আসবে।

রাহেলা বানুকে সালাম করে দুই বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে চলে যায় মুক্তিযোদ্ধারা।

বৰা শেষ।

আশিনের শিউলি ক্ষেত্ৰৰ দিন শুৰু হয়েছে। একদিন দৱজায় টুকুক শব্দ হয়।

— খুকুমণিৰা দৱজা থোল।



দুই বোন লাফ দিয়ে উঠে দরজা খোলে। মুক্তিযোদ্ধারা আসে। ভাত খায়। নয়তো একটু ঘুমিয়ে নেয়। রাতের অন্ধকারে আবার চলে যায়।

ঘোরতর যুদ্ধ চলছে চারদিকে।

রুমা আর রুবা রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না।

ওরা আবার অপেক্ষা করে একটি ডাক শোনার জন্য,

— খুকুমগিরা দরজা খোল, আমরা মুক্তিযোদ্ধা।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

খুশবু উদগ্রীব বিবিসি গণহত্যা বজ্ঞাবন্ধু ট্রেনিং গপগপিয়ে মুক্তিবাহিনী
মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প মিলিটারি

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বজ্ঞাবন্ধুর মিলিটারির গণহত্যা উদগ্রীব বিবিসির মুক্তিযোদ্ধারা

ক. রুবা হয়ে বলে, মা আমার গল্পটা বল।

খ. সবাই আমগাছের নিচে বসে রেডিওতে খবর শুনছে।

গ. ঢাকা শহরে গত মধ্যরাতে শুরু করেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

ঘ. জসীমের মনে পড়ে কিছুদিন আগে ওরা ৭ই মার্চের ভাষণ শুনছিল।

ঙ. বিকেলে বাজারে গেলে পাকিস্তানি সামনে পড়ে যায় জসীম।

চ. রাতে এলে তার জন্য ভাত রান্না করবে।

৩. প্রশ়ঙ্গুলোর উভয় মুখে বলি ও শিথি।

ক. রুমার জন্মদিনের গঞ্জটি কী?

খ. রুবার জন্মদিনের গল্পটি কী?

গ. রাহেলা বানু প্রতিদিন দুই মুঠো চাল উঠিয়ে রেখে দিত কেন?

ঘ. গভীর রাত পর্যন্ত দুই বোন কেন জেগে থাকত?

ঙ. মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জসীম মিয়ার পরিবারের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর।

চ. “আমাৱ মেয়েগুলোৱ অনেক বুদ্ধি। অনেক বড় হ মা।” – “অনেক বুদ্ধি” এবং “বড় হ”

ବଲତେ ତୁମି କୀ ସୋର୍ବ ?

ছ. একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ করার জন্য কী কী যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা দরকার?

৪. ঠিক উভয়টিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. ফুলের পাপড়ি ছিড়ে দুই বোন কোথায় রাখতো?

- | | |
|----------------|-----------------|
| ১. বইয়ের ভিতর | ২. বালিশের নিচে |
| ৩. কোটার ভিতর | ৪. খাতার ভিতর |

খ. আমগাছের নিচে বসে জীব কিসের খবর শুনছিল?

- | | |
|-----------------|----------------|
| ১. বাজারের খবর | ২. যুদ্ধের খবর |
| ৩. গণহত্যার খবর | ৪. বাড়ির খবর |

গ. বুবা বুমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, যদ্য মানে কী বুবু? বুমা দৃই হাতে ঢোখ ঘুচে বলে-

১. বাবার মরে যাওয়া ২. মায়ের মরে যাওয়া
৩. ভাই বোনের মরে যাওয়া ৪. শ্রামী মরে যাওয়া

ସ୍ବ. କଥନ ଶିଆଲି ଫଳ ଫୋଟେ?

- | | |
|----------------|-----------------|
| ১. আশ্বিন মাসে | ২. কার্তিক মাসে |
| ৩. দিনের বেলা | ৪. মাঘ মাসে |

৫. শব্দগুলোকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ অনুযায়ী সাজাই

এমন কিছু শব্দ আছে যা দিয়ে কারোর নাম, জায়গার নাম বোঝায় সেগুলো বিশেষ। যেমন-
নদী শুকিয়ে গেছে। এখানে ‘নদী’ বিশেষ পদ। আবার এমন শব্দ আছে যা দিয়ে বিশেষ
শব্দের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা বোঝায় সেগুলো বিশেষণ পদ। যেমন- মুনা
দৌড়ে দ্রুত পালিয়ে গেল। এখানে ‘দ্রুত’ বিশেষণ পদ। এবার নিচের শব্দগুলো থেকে বিশেষ
ও বিশেষণ পদ আলাদা করি।

গাছ, ভাত, শুকনো, ভীষণ, নদী, কাঁপা, দরজা, রাইফেল, গরম, গভীর, হাঁড়ি, দৃত।

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

জন্ম	মৃত্যু	যুদ্ধের সময় দেশের অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছিল।
কানা
তরা
যুদ্ধ
দূর
শুকনো

৭. বাক্য রচনা করি।

জন্মদিন আয় অপেক্ষা মুক্তিযোদ্ধা রেডিও

৮. কথাগুলো বুঝে নিই।

ধপাস করে পড়া – হঠাতে ধপ করে পড়া। ট্রাক থেকে চালের বস্তাটি ধপাস করে পড়ে গেল।

মুখ খুবড়ে পড়া – উপুড় হয়ে বা হুমড়ি খেয়ে পড়া। ছেলেটা হেঁচট খেয়ে মুখ খুবড়ে পড়ে গেল।

গপগপিয়ে খাওয়া – একসঙ্গে বেশি খাবার মুখে পুরে দ্রুত খাওয়া। সে গপগপিয়ে সব ভাত খেয়ে ফেলল।

দুই সের – আমাদের দেশে আগে ওজন মাপের জন্য ‘সের’ ব্যবহার করা হতো।

১ সের পরিমাণ বর্তমান মাপে ১ কেজির কিছু কম (প্রায় ০.৯৩৫ কেজি)।

১ কেজি = ১.০৭ সের (প্রায়)

৯. কর্ম-অনুশীলন।

আমার শ্রেণিশিক্ষক, মা-বাবা, দাদা-দাদি, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিকট থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গল্প শুনে তা লিখি ও শ্রেণির সহপাঠীদের পড়ে শোনাই।



সেলিনা হোসেন

লেখক-পরিচিতি

সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। তিনি ১৪ই জুন ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা একাডেমিতে পরিচালক পদে থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। ‘সাগর’, ‘গল্পে বর্ণমালা’, ‘কাকতাড়ুয়া’, ‘চাঁদের বুড়ির পাতা ইলিশ’ ইত্যাদি তাঁর লেখা শিশু-কিশোর উপযোগী বই। তিনি সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। ২০০৯ সালে ‘একুশে পদক’ লাভ করেন। ২০১০ সালে রবিন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা থেকে তিনি ডিলিট উপাধি পান। ২০১১ সালে দিল্লির সাহিত্য একাডেমি থেকে প্রেমচান্দ ফেলোশিপ পান।

ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ଜେନେ ନିଇ

ଶବ୍ଦ	ଅର୍ଥ
ଅ ଅଚିନ୍ପୁର ଅବଧାରିତ ଅବରୁଦ୍ଧ ଅହକାର ଅପାର ଅନାଡୁମ୍ବର ଅମିତ ତେଜ ଅଭିଭୂତ ଅସିଚାଲନା ଅମୂଳ୍ୟ	<ul style="list-style-type: none"> - ଅଚେନ୍ନା ସ୍ଥାନ । - ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଯା ହବେଇ, ନିର୍ଧାରିତ । - ଶ୍ରୁଦ୍ଧ ଦିଯେ ବୈଷ୍ଟିତ, ବନ୍ଦୀ । - ନିଜେ ଅନେକ ବଡ଼ କେଉଁ - ଏରକମ ମନେ କରା । - ଅଗାଧ, ଅସୀମ । - ସାଦାସିଥା । - ଅସୀମ ସାହସ ଆର ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି । - ଭାବାବିଷ୍ଟ ବା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୟେ ପଡ଼ା । - ତଳୋଯାର ନିଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରାର ବିଦ୍ୟା । - ଯାର ମୂଳ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ କରା ଯାଇ ନା ।
ଆ ଆସନ୍ନ ଆଚ୍ଛାଦନ ଆତ୍ମାନକାରୀ ଆସମର୍ପଣ ଆନକୋରା ଆସ୍ତାନା ଆଟେପ୍ଟ୍ରିଚ୍ ଆରାଫାତ ଆମିର	<ul style="list-style-type: none"> - ନିକଟ । - ଢାକନି, ଛାଉନି । - ନିଜେର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେଛେ ଯିନି । - ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଅନ୍ୟେର ବଶ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା । - ନାହନ । - ବସବାସେର ଜାଯାଗା । - ସର୍ବାଙ୍ଗେ, ସାରା ଶରୀରେ । - ମଙ୍କା ଥେକେ ପ୍ରାୟ ବାରୋ ମାଇଲ ପୂର୍ବେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୟଦାନ । - ବଡ଼ଲୋକ; ଧନୀ; ସମ୍ପଦଶାଲୀ ସନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ ମୁସଲମାନ; ମୁସଲମାନ ଶାସକେର ଉପାଧି
ଇ ଇଞ୍ଜିତ ଟ ଉଦୟୀବ ଉପତ୍ୟକା ଉପାସନା	<ul style="list-style-type: none"> - ଇଶାରା ।
ଉ ଉର୍ମି ଉର୍ମିମାଳା ଏ ଏଫ୍‌ଏ ଏକ୍‌ପେରିମେନ୍ଟ ଏ ଐତିହାସିକ କ କଳକାହିନି	<ul style="list-style-type: none"> - ପ୍ରତିମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଗେକ୍ଷା କରା, ଥୁବ ଆଗ୍ରହୀ, ବୟସ । - ଦୁଇ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତେର ମାବାଖାନେର ସମତଳ ଭୂମି ବା ନିଚୁ ଭୂମି ଅଥବା ପାହାଡ଼-ପର୍ବତେର ପାଶେର ଭୂମି । - ଏବାଦତ; ଆରାଧନ; ଆଲ୍ଲାହର ଧ୍ୟାନ ।
ଟ ଟେମ୍‌ ଟେମ୍‌ମାଳା ଏ ଏଫ୍‌ଏ ଏକ୍‌ପେରିମେନ୍ଟ ଏ ଐତିହାସିକ କ କଳକାହିନି	<ul style="list-style-type: none"> - ନଦୀ ଓ ସାଗରେର ଢେଡ଼ । - ଢେଡ଼ସମ୍ମୁହ, ଢେଟଗୁଲୋ ।
ଏ ଏଫ୍‌ଏ ଏକ୍‌ପେରିମେନ୍ଟ ଏ ଐତିହାସିକ କ କଳକାହିନି	<ul style="list-style-type: none"> - (Final Arts) ଆଜକେର ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷାର ସମତୁଳ୍ୟ । - ପରୀକ୍ଷା-ନିରୀକ୍ଷା ।
କା କାନାଡ଼ା କାରାରୁଦ୍ଧ କାବାଶରିଫ କଢ଼ି କିଚିର ମିଟିର କିରଣ କ୍ରୀତଦାସ କୁମାର	<ul style="list-style-type: none"> - ଯୀରା ଇତିହାସ ଲେଖେନ ବା ଭାଲୋ ଜାନେନ । ଇତିହାସେ ସ୍ଥାନ ଲାଭେର ଯୋଗ୍ୟ ବା ଇତିହାସ-ଭିତ୍ତିକ ହେଲେବେ ତାକେ ଐତିହାସିକ ବଳା ହୟ । - ଯେ କାହିନି କଳନା କରେ ଲେଖା ହୟ । ଏକ ପ୍ରକାର କଳକାହିନି ଆହେ ଯା ବିଜ୍ଞାନକେ ପ୍ରଧାନ କରେ ଲେଖା ହୟ, ତାକେ ବଳା ହୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କଳକାହିନି । - ଟ୍ରେନର ଆମେରିକା ମହାଦେଶରେ ଏକଟି ଦେଶ । - ଜେଲଖାନା ବା କାରାଗାରେ ଆଟକ ରାଖା । - ମଙ୍କାଯ ଅବସ୍ଥିତ ବିଖ୍ୟାତ ଆଲ୍ଲାହର ସର । - ଏକ ଧରନେର ଛେଟ ସାଦା ବିନ୍ଦୁକ । - ପାଥିର ଡାକାଡ଼ାକିର ଆଓୟାଜ । - ଆଲୋ । - କେଳା ପୋଲାମ; ମୂଳ୍ୟ ଦିଯେ ଯେ ଭ୍ରତ୍ୟକେ ଯାବଜ୍ଜୀବନେର ଜନ୍ୟ କେଳା ହେୟେଛେ । - ରାଜାର ଛେଲେ (ରାଜକୁମାର) ।

কুর্ণিশ
কাঁকন
কোলাহলকল

- মাথা নত করে অভিবাদন করা।
- হাতে পরার গহনা।
- কোলাহল হলো অনেক মানুষের শোরগোল, গোলমাল। আর ‘কল’ বলতে বোবায় মানুষের গলার সুন্দর আওয়াজ। এখানে খেলায় সকলে এক সঙ্গে গোল-গোল চিকির করলে বেশ ভালো শোনায় বলে ‘কোলাহলকল’ বলা হয়েছে।
- সৈনিক বা যোদ্ধাদের অস্থায়ী ঝাঁটি। সেনাছাউনি।

ক্যাম্প

খ
খাজনা
খাটিয়া
খুশবু
শ্রিষ্টপূর্ব

- কর বা ট্যাঙ্গ।
- কাঠের তৈরি খাট।
- সঙ্গথ
- যিশুখ্রিষ্টের জন্মের পূর্বের বৎসর বোবাতে বলা হয় শ্রিষ্টপূর্ব, আর তার জন্মের পরের বছরগুলোকে বলা হয় শ্রিষ্টাব্দ।

ক্ষ

ক্ষত

গ
গপগাপিয়ে
গণহত্যা
গহুর
গর্জে ওঠা
গর্দন
গিরিডি

- শরীরের কাটা স্থান বা আঘাত পাওয়া স্থান।
- গপগপ করে।
- অনেক লোককে বিনা অপরাধে মেরে ফেলা।
- গর্জ।
- ঝুঁকার দিয়ে ওঠা।
- ঘাড়, গলা।
- ভারতের ঝাড়খন রাজ্যে অবস্থিত। এটি গিরিডিহ জেলার একটি প্রধান শহর। ১৮৭২ সালের আগে স্থানটি হাজারিবাগ জেলার মধ্যে ছিল।
- গৃহস্থ, সৎসারী লোক। গেরস্ত লোকের বহু কাজকর্ম থাকে।

গেরস্ত

ঘ

ঘোর

চ
চকাচকি
চম্রলোক
চরণ
চিনচিন

- অত্যন্ত, অনেক বেশি, গভীর।
- হাঁসজাতীয় পাখি।
- চাঁদের দেশ।
- পা।
- অল্প অল্প ব্যথা বা ঝুলা বোবায় এমন শব্দ।

জ

জগৎ
জনপদ
জেদি

- পৃথিবী।
- যেখানে অনেক মানুষ এক সাথে বসবাস করে, লোকালয়, শহর।
- একগুঁয়ে, কোনো কাজ করতে যে নাছোড়বান্দা।

ট

টনটন
টহল
টেপা পুতুল

- যন্ত্রণা বোবায় এমন অনুভূতি।
- পাহারা দেওয়া।
- কুমাররা নরম এঁটেল মাটির চাক হাতে নিয়ে টিপে টিপে নানা ধরনের ও নানা আকারের পুতুল তৈরি করেন। টিপে টিপে তৈরি করা হয় বলে এসব পুতুলের নাম টেপা পুতুল। তবে এসব মাটির পুতুলের হাত-পা বা জোড়গুলো একটু ভিজে ভিজে মাটি দিয়ে যন্ত্র করে দাগাতে হয়।
- ‘টেরা’ অর্থ মাটি, আর ‘কেটা’ অর্থ পোড়ানো। পোড়ামাটির তৈরি মানুষের ব্যবহারের সব রকমের জিনিস টেরাকেটা হিসেবে পরিচিত।
- গাঢ়, সুন্দর।
- কোনো বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া বা নেওয়া।

টেরাকেটা

টুকুটুক
ট্রেনিং

ড
ডনকুস্তি
ডিপ্টি
ড্রিবলিং

- বুকডন দিয়ে শরীরচর্চা আর শারীরিক শক্তির পরীক্ষা।
- একধরনের নৌকা।
- এটা ফুটবল খেলার একটা কোশল। ইংরেজি dribble শব্দের অর্থ হলো পায়ে-পায়ে বল গড়িয়ে নিয়ে কৌশলে বল কাটিয়ে নিয়ে যাওয়া।

ত

তট
তটস্থ
তারারা
তিরিঙ্গি
তুলকালাম কাণ্ড
তেষ্টা

- নদীর তীর।
- ব্যতিব্যস্ত।
- আকাশের তারকারাঙ্গি।
- খারাপ মেজাজ।
- এলাহি কাণ্ড।
- তৃক্ষণা, পিপাসা। তেষ্টায় যেন ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

দ

দাপটে
দূর্ঘ
দুর্ভেদ্য
দুঃসাহসী
দিগন্ত
দুর্ত গতিতে
দেশান্তর
দেলাই মাথা

- প্রবল প্রতাপের সঙ্গে।
- প্রাচীর বা দেয়াল ধ্রে সেনানিবাস।
- যা কফ্টে ভেদ করা যায়।
- অত্যধিক সাহস আছে এমন।
- প্রান্তরের শেষে আকাশ যেখানে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে বলে মনে হয়।
- খুব তাড়াতাড়ি করে, জোরে যাওয়া।
- অন্য দেশ।
- মাথা নাড়াই।
- পৃথিবী।

ধ

ধরা
ন

নকশা

- রেখা দিয়ে ঔকা ছবি। শখের ইঁড়ি, টেপা পুতুল বা পশুপাখির গায়ে গ্রামের কুমার শিঙারা নানা রঙের ছবি আঁকেন। এ ছবিগুলোই হলো নকশা।
- গভীর রাত্রি। মাঝ রাত।
- জনশূন্য স্থান।
- প্রমাণ, চিহ্ন বা উদাহরণ।
- কোনো রকম বিচার বিবেচনা ছাড়া।
- অন্যায়ের শিকার, নিপীড়িত।

প

পতন
পরম্পর
পরাধীন
পন্থা
পাত্তি
পর্যবেক্ষণ
পাখপাখালি
পার্কট
পার্টিত্যপূর্ণ
পুটলি
প্রকৃতি
প্রাচীনতম
প্রাত্তর
প্রতিবাদী
প্রতিধ্বনি
প্রবাসী
প্রবাহিত হওয়া
প্রবেশিকা/প্রবেশিকা পরীক্ষা

- পড়ে যাওয়া।
- একের সঙ্গে অন্যের।
- পরের অধীন, স্বাধীন নয়।
- পথ।
- কাপড়ের লম্বা টুকরা। এটা দিয়ে শরীরের কোনো স্থান বাঁধা থাকে।
- কোনো কিছু বা প্রাকৃতিক ঘটনা খেয়াল করে দেখা।
- নানা ধরনের পাথি।
- নির্দয়।
- জান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ।
- বোঁচকা।
- নিসর্গ।
- প্রাচীন হলো পুরাতন বা বহুকাল আগের কিছু। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলে তম যোগ করা হয়।
- মাঠ, জনবসতি নেই এমন বিস্তীর্ণ ভূমি।
- যে কোনো উক্তির বিরুদ্ধে যারা আপত্তি জানায়।
- বাতাসে ধাক্কায় ধনির পুনরায় ফিরে আসাকে প্রতিধ্বনি বলে।
- ভিন্নদেশে যে বাস করে।
- বয়ে চলা, গড়িয়ে গড়িয়ে চলা।
- আজকের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা। প্রবেশিকা পাস করলে কলেজে প্রবেশ করা যেত। তাই নাম হয়েছিল প্রবেশিকা।
- প্রত্ব শব্দের অর্থ অতি পুরাতন বা প্রাচীন। এই সম্পর্কিত যে তত্ত্ব তাকে বলা হয় প্রত্বতত্ত্ব। তবে, প্রাচীন কালের জিনিসপত্র, মুদ্রা, অটোলিকা ইত্যাদি বিচার করে এবং ইতিহাস খুঁজে যা বের করা হয় বা যেতাবে বের করা হয় তাকে বলে প্রত্বতত্ত্বিক।
- উচ্চস্থান থেকে নিম্নস্থানে বেগে পতন।
- খোওয়া, পানি দিয়ে পরিষ্কার করা।

ଫ

ଫରମାଯେସ
ଫୁରସତ
ଫେରିଅଳା
ଫେଡ୍ରେ
ଫୋଟେ

- ହୁକୁମ, ଆଦେଶ ।
- ଅବସର, ଅବକାଶ, ଛୁଟି ।
- ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ବା ବାଡ଼ିତେ ସ୍ଥରେ ଯାରା ଜିନିସପତ୍ର ବିକ୍ରି କରେନ ।
- ଛିଡ୍ରେ ।
- ପ୍ରସ୍ଫୁଟିଟ ହୟ, ଫୁଟେ ଓଠେ ।

ବ

ବରଣ
ବରକମ୍ପାଜ
ବଞ୍ଚ
ବଦ୍ଧ
ବଜାବଜ୍ମୁ
ବର୍ଗି
ବରେଣ୍ୟ
ବାହାର
ବାରି
ବାନ୍ଦା
ବିଜୁ
ବିଜୟନ୍ତ୍ର
ବିବିସି
ବିଲୁଣ୍ଡ
ବିଷ୍ଵାଦ
ବିୟ-ନଜର
ବେଳାଭୂମି
ବେଶ୍-ବେଶ
ବୈଚିତ୍ର୍ୟ
ବାଶେର କେଳ୍ପା

- ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ ।
- କନ୍ଦୁକଥାରୀ ସିପାଇ ବା ରଙ୍କୀ ।
- ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ କରେ ଝାଡ଼େର ଆକାଶେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକାଶ ପାଓଯା, ବାଜ ।
- ବର୍ଷ ।
- ଜାତିର ଜନକ ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରହମାନେର ଉପାଧି ।
- ମାରାଠା ଦସ୍ୟ ।
- ମାନ୍ୟ ।
- ସୌଲଦ୍ଧ୍ୟ ।
- ପାନି । (ଶବ୍ଦଟି ଶୁଦ୍ଧ କବିତାଯ ବ୍ୟବହୃତ ହୟ ।)
- ଗୋଲାମ; ଦାସ; ଏକାନ୍ତ ବାଧ୍ୟ ।
- ଚାକମାଦେର ନବବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ।
- କୋନୋ କିଛି ଜ୍ଯା କରାର ପର ଯେ ସ୍ତର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ କରେ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରା ହୟ ।
- ଯୁକ୍ତରାଜେର ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରେ ନାମ ।
- ଯା ଲୋପ ପୋଯେଛେ ।
- ଖେତେ ମଜା ନଯ ଏମନ ।
- ହିଂସାଗୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତି, କୁନ୍ଜର ।
- ସମୁଦ୍ରର ତାରେ ବାଗୁମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ।
- ବୀଶବାଗାନ ।
- ବିଭିନ୍ନତା ।
- ବାଁଶ ଦିଯେ ତୈରି କେଳା ବା ଦୂର୍ଘ ।

ଶ

ଭୟଙ୍କର
ଭାସଣ

- ଭୀଷଣ, ଭୀତିଜନକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ।
- ବକ୍ରତା, ବିବୃତି, ଉତ୍ତି ।

ମ
ମହାନବି

- ଆଲ୍ଲାହର ପଯଗମ୍ବର; ରାସୁଲ; ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷଦେର ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିନି । ଶେ ନବି ହ୍ୟରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସ)-କେ ମହାନବି ହିସେବେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରା ହୟ ।

ମଜ୍ଜଲୁମ
ମହାନ
ମନସ୍ମୀ
ମହାକଳରବ

- ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ନିର୍ଯ୍ୟାତି ।
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମହେ, ଉଦାର ।
- ଉଦାରମନା ।

- କଳରବ ଶଦେର ଅର୍ଥ ଅନେକ ମାନୁଷେର ଗଲାଯ ଏକ ସାଥେ ଚେତ୍ତାମେଚି,
ଆୟାଜ । ମହାକଳରବ ଅର୍ଥ-ଭୀଷଣ ଚିତ୍କାର, ଚେତ୍ତାମେଚି ।
- ମୃତ୍ୟୁର କର୍ତ୍ତ ।
- ଦୟା, ମମତା ଆଛେ ଯେ ନାରୀର ।
- ଯେ ଓସୁଧ ବା ମଳମ ଚେପେ-ଚେପେ ଶରୀରେ ଲାଗାତେ ହୟ ।
- ସାମରିକ ବାହିନୀ । ଗଲେ ପାକିସ୍ତାନି ହାନାଦାର ବାହିନୀକେ ବୋବାନୋ ହେଯେଛେ ।
- ସାଧୀନତାକାମୀ ।

ମରଣ-ୟକ୍ରମା
ମାୟାବତୀ
ମାଲିଶ
ମିଳିଟାରି
ମୁକ୍ତିକାମୀ
ମୁକ୍ତିବାହିନୀ
ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା
ମୁଖ
ମେଦିନୀ
ମୋହ
ମୃଣଶିଳ୍ପ

- ଶତ୍ରୁର ଦଖଲ ଥେକେ ଦେଶକେ ରଙ୍କା କରାର ଜନ୍ୟ ଲଡ଼ାଇ କରେଛି ଯେ ସେନାଦଳ ।
- ଯିନି ସାଧୀନତା ବା ମୁକ୍ତିର ଜନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରେନ ।
- ବିମୋହିତ, ଆନନ୍ଦିତ ।
- ଭୂପୃଷ୍ଠ, ପୃଥିବୀ ।
- ଅଞ୍ଜଳ, ମାୟା, ମୂର୍ଖ ।
- ମାଟିର ତୈରି ଶିଲ୍ପକର୍ମକେ ଆମରା ବଲି ମାଟିର ଶିଲ୍ପ ବା ମୃଣଶିଳ୍ପ । ଆମାଦେର ଦେଶେର ସବଚେଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଲ୍ପ ହଚ୍ଛେ ମୃଣଶିଳ୍ପ ।
- ବିଖ୍ୟାତ, କୀର୍ତ୍ତିମାନ ।
- ଆରବି ବହୁରେର ଏକଟି ମାସେର ନାମ ।
- ଅନ୍ୟୁଗ ବା ସମୟ ।

ର

ରଯେଲ
ରକ୍ତରଙ୍ଗିତ
ରକ୍ଷୀ
ରାଜପ୍ରାସାଦ
ରକ୍ଷଣମୂର୍ତ୍ତି

ଲ

ଲବେଜାନ

ଶ

ଶଖ
ଶଖର ହାଡ଼ି

ଶକ୍ତିଧର
ଶକ୍ତିତ
ଶଦ୍ଦୂସଣ
ଶାଲବନ ବିହାର

ଶାହାନଶାହ
ଶାହଜାଦା
ଶାଯିତ
ଶାୟେସ୍ତା
ଶିର
ଶିଳ୍ପୀ

ସ

ସଂକଳ
ସରକାର
ସମତଳ ଭୂମି
ସମସ୍ବରେ
ସମ୍ମେଲନ
ସମାବେଶ
ସାର୍ଥକ
ସାହ୍ରାଇ
ସିନ୍ଧୁ
ସେର
ମେହ-କଗା
ସ୍ଵାଦ
ସ୍ଵଜନ
ସ୍ଵର୍ଗଲତା

ସୌଭାଗ୍ୟ
ସଞ୍ଚାର
ସ୍ନୋତସ୍ଥିନୀ

ହ
ହାନାଦାର
ହୁଙ୍କାର
ହଜ

ହିଜରି

- ରାଜକୀୟ ।
- ରଙ୍ଗ ଦିଯେ ଲାଲ କରା ହେବେ ଯା ।
- ପ୍ରହରୀ, ସେନା ।
- ରାଜପୁର ବା ରାଜବାଡ଼ି ।
- ଉତ୍ତରପ ।
- ହୟରାନ ।
- ମନେର ଇଚ୍ଛା, ଝୁଟି ।
- ଶଖ କରେ ପଢ଼େର ଜିନିସ ଏହି ସୁନ୍ଦର ହାଡ଼ିତେ ରାଖା ହୁଏ, ତାହିଁ ଏର ନାମ ଶଖର ହାଡ଼ି ।
- ଶକ୍ତି ଆହେ ଯାଇ ।
- ଭୀତ ।
- ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋଲାହଳେ ଶଦ୍ଦୂସଣ ଘଟେ ।
- କୁମିଳାର ମଯନାମତିତେ ମାଟି ଥୁଣ୍ଡେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବେ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତାର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ । ଅଟ୍ଟାଦଶ ଶତକେର ଏହି ପୁରାକୀର୍ତ୍ତ ବାଲ୍ମୀଦେଶେର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ପରିଚାୟକ । ଶାଲବନ ବିହାରେ ପାଉୟା ଗେଛେ ନାନା ଧରନେର ପୋଡ଼ିମାଟିର ଫଳକ ।
- ବାଦଶାହ, ରାଜାଧିରାଜ ।
- ବାଦଶାର ପୁତ୍ର ।
- ଶୁଯେ ଆହେ ଏମନ ।
- ଶାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ।
- ମାଥା ।
- ଯିନି କୋନୋ ଶିଳ୍ପକଳାର ଚର୍ଚା କରେନ ତିନିଇ ଶିଳ୍ପୀ । ଯେମନ- ସଜୀତଶିଳ୍ପୀ,
ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ।

- ପ୍ରତିଜ୍ଞା ।
- ଦେଶ ଚାଲାଯ ଯେ ।
- ଯେ ଜମି ଉଚ୍ଚନ୍ତି ନଯ, ପାହାଡ଼ି ନଯ, ତାକେଇ ସମତଳ ଭୂମି ବଲେ ।
- ଏକସଙ୍ଗେ ଶବ୍ଦ କରା ବା କଥା ବଲା ।
- ଜନସମାବେଶ ।
- ଏକତ୍ରେ ଅବସ୍ଥାନ ।
- ସଫଳ ।
- ରାଖାଇଲଦେର ନବବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ।
- ସାଗର ।
- ପୁରାନୋ ପଦ୍ଧତିର ଓଜନ ମାପାର ଏକକ (୧ ସେର= ପ୍ରାୟ ୦.୯୩୫ କେଜି) ।
- ଆଦର

- ଖେତେ ଭାଲୋ ଲାଗେ ଏମନ ।
- ନିଜେର ଲୋକ, ଆତୀୟ, ବନ୍ଦୁବାସ୍ଥବ ।
- ସୋନଲି ରଙ୍ଗେର ବୁନୋ ଲତା । ଅନେକ ସମୟ ପଥେର ଧାରେର ଗାହଗାହଳି ଭରେ ଥାକେ । ଏହି ଲତା ଆପନା-ଆପନି ଜନ୍ମାଯ ।
- ଭାଲୋ ଭାଗ୍ୟ ।
- ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିସ ।
- ନଦୀ ।

- ଆକ୍ରମଣକାରୀ ।
- ଚିତ୍କାର ।
- ହିଜରି ଜିଲ୍ଲାହଜ ମାସେର ୯ ତାରିଖେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ଇହାମ ବେଂଧେ ମକାର ଅଦୂରବତୀ ଆରାଫାତ ମୟଦାନେ ଅବସ୍ଥାନ ଓ ପରେ କାବାର ତେବେବିର ସଂବଲିତ ଇସଲାମି ଅନୁଷ୍ଠାନ ।
- ଯଶୁଦ୍ଧିତେର ଜନ୍ମେର ୬୨୨ ବର୍ଷ ପରେ ହୟରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସ)-ଏର ମକାର ତାଗ କରେ ମଦିଲାୟ ଗମନେର (ହିଜରତେର) ଦିନ ଥେକେ ଗଣିତ ଚାନ୍ଦ ଅନ୍ଦ ବା ବର୍ଷ ।

ସମାପ୍ତ

২০২১ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৫ম- বাংলা



পরনিন্দা ভালো নয়



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য